উড্রো উইলসন

ক্লিফোর্ড স্মিথ

অনুবাদক —শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী



শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড. কলিকাতা—৯

প্রকাশ - ১৯৬০

প্রকাশক
শ্রীঅরুণ পুরকায়স্থ
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা ৯

মুদ্রক
শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
৩৯।১ শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা - ৬

সূচী

এক

প্রস্তুতি পর্ব্ব

জেফারসনের পরে যাঁরা প্রেসিডেণ্টের আসন অলঙ্কৃত করেন. তাঁদের মধ্যে অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন এবং উড্রো উইলসন এই দুজন ছিলেন বিশিষ্ট ডেমোক্রাট। এঁরা উভয়েই স্কচ্-আইরিশ বংশোদ্ভব এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া বংশগত গুণাবলী এঁদের জীবনগঠনের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। এঁরা দুইজনেই ছিলেন দক্ষিণী এবং দুইজনেই প্রেসবিটেরিয়ান। রাজনৈতিক সঙ্কটের সময়ে এঁরা উভয়েই ডেমোক্রাটিক দলের শীর্ষ-স্থানীয় নেতারূপে স্বীকৃত হন। পদাধিকার সুলভ ক্ষমতা প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা যখন দেখা দেয়, তখন তাঁরা উভয়েই ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে চরিত্র গত মিল এই পর্যন্ত। এর পর যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় তা মৌলিক।

একজন ছিলেন পরিষ্কার ভাবে জনগণের একজন; বাস্তববাদী কঠোর জীবনের মুখোমুখী হয়ে যাঁর ধারণাগুলি গড়ে উঠেছিল এবং যা তিনি বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে বাস্তবে প্রয়োগ করতেন; যাঁর অবিস্মরণীয়, রসিক চরিত্রালেখ্য একক ও অনন্য হয়ে আছে। অপরজন গভীর জ্ঞানান্বেষী, একজন ভাববাদী যাঁর কর্ম্মজীবন গড়ে উঠেছিল জ্ঞানচর্চার আবদ্ধ জীবন মাধ্যমে, যিনি গণতন্ত্র সম্বন্ধে এমন এক তত্ত্বের উদ্ভাবন

করেছিলেন যার মূল ছিল মার্কিনী সরকারী ব্যবস্থায় অন্তর্নিহিত এবং যার লক্ষ্য ছিল জগতের জাতিগুলির সৌভ্রাত্রতায় তাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

উড্রোর পিতামহ জেম্স উইলসনই উইলসন বংশের প্রথম লোক—যিনি ভাগ্যান্বেষী হয়ে এ দেশে এসে উপস্থিত হন। ১৮০৭ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত কাউন্টি ডাউন থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অভিমুখে জাহাজ যোগে যাত্রা করেন। সেই দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রা পথেই তাঁর জীবনে প্রণয়ের প্রথম উন্মেষ ঘটে। বিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ জেম্সের মন তখন নতুন দুনিয়ার নবজীবনের সুখস্বপ্নে মশ্‌গুল। এ হেন সময়ে প্রেম যদি ইসারায় আহ্বান জানায়, তাতে সাড়া না দিয়ে থাকা কি সম্ভব!

অ্যান অ্যাডাম্স নাম্নী এক ষোড়শী তরুণী সেই জাহাজেরই যাত্রী। হয় কাউন্টি ডাউন, নয় কাউন্টি অ্যান্ট্রিম থেকে কেন যে এই মেয়েটি যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী রূপে এসেছিল সে রহস্য আজও অজ্ঞাত। যা হোক অ্যাটলান্টিক মহাসাগরদিয়ে আনাগোনার পথে প্রায়ই যা ঘটে থাকে, জেম্স ও অ্যানের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটলো না, তারা পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হল। যে বছরে তারা ফিলাডেল্‌ফিয়ায় এসে পৌঁছোয় তার পরের বছরই তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্কচ্ আইরিশ অধিকাংশ বহিরাগতদের মত এদেরও প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমতের উপর আস্থা অগাধ। এই কারণে ফিলাডেল্‌ফিয়ার চতুর্থ প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের প্যাষ্টর রেভারেণ্ড জর্জ-সি. পট্‌স তাঁদের বিবাহ বাসরে পৌরহিত্য করেন। যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তবিংশতিতম প্রেসিডেণ্টের পূর্ব-পুরুষগণের জীবনের সুরু থেকে শেষ অবধি গীর্জা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে।

একুশ বৎসর বয়স্ক বর জেম্স উইলসন এক খবরের কাগজের আফিসে মুদ্রাকরের কাজ করতেন। গণতন্ত্রের উপরে তাঁর আস্থা ছিল অটল। ...াডেল্‌ফিয়ায় এসে ১৫, ফ্রাঙ্কলীন স্কোয়ার থেকে প্রকাশিত 'অরোরা' ...ক সাময়িক পত্রিকার আফিসে তিনি কাজে নিযুক্ত হন। আমে-...ংবাদিকতা জগতের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বেন্ ফ্রাঙ্কলীন একদা ...তই বাস করতেন। উলিয়াম ডুয়েন ছিলেন এই পত্রিকার ... কাজে যোগদানের পর পাঁচ বছরের মধ্যে কাগজের নিয়ন্ত্রণ

ভার যদিও জিমি উইলসনের হাতে আসে, তবু বেশী দিন তিনি সে দায়িত্ব বহন করেন নি। ঝুঁকি নেবার নেশা ছিল তাঁর শোণিতের সঙ্গে মিশে। পশ্চিম তাঁকে ডাকতে লাগলো ইসারায়। ওহিও থেকে প্রকাশিত 'ওয়েষ্টার্ণ ওয়ার্লড' ও 'ষ্টুবেন ভিল গেজেটের' তিনি সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন ১৮১৫ সালে। পরে এই পত্রিকারই আপোষ-বিহীন ও রক্ত-ক্ষরা সম্পাদকীয়ের মাধ্যমে অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন ও তাঁর সমস্ত কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রাম পরিচালন করেন।

বড় পরিবার এবং রাজনৈতিক বিরোধ ছিল তখনকার দিনের প্রধান উপজীব্য। বিবাহের পর বারো বছর উত্তীর্ণ হবার আগেই জিমি ও অ্যান উইলসন সাত পুত্র এবং তিন কন্যার জনক-জননী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

জোসেফ রুগ্‌লস উইলসন ছিলেন ছেলেদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। ওহিওর ষ্টুবেন ভিলেতে তাঁর জন্ম হয় ১৮২২ সালে। আর সব ভাইদের মত তিনিও মুদ্রাকরের কাজ শিক্ষা করেন। তিনি নিজের উদ্যোগেই ছোট একটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কিছুদিন সে কাজে লিপ্ত থাকতে না থাকতেই, তাঁর মন টানতে থাকে প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জার দিকে। ১৮৪৭ সালে তিনি ধর্মযাজকের জীবন গ্রহণ করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে উড্রো পরিবারের প্রথম বসতকারীর কন্যা জেসী উড্রোরসনেঁ তাঁর সাক্ষাত ঘটে সেই বছরেই।

জেসীর পিতা টমাস উড্রো ছিলেন একজন প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মযাজক। বিদ্যাবত্তা ও বাগ্মীতার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল। উড্রো পরিবারে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা হয় সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন গীর্জার সঙ্গে, কিংবা শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন উৎসাহী কর্মী। উড্রো পরিবারের প্রথম যে ব্যক্তিটি আমেরিকায় আসেন তিনি হলেন রেভারেণ্ড টমাস উড্রো, গ্লাসগো বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করে তিনি নিউইয়র্কে আগমন করেন ১৮৩৬ সালে। সেইখানেই সামান্য রোগ ভোগের পর তাঁর পত্নী আটটী ছেলে-মেয়ে রেখে পরলোক গমন করেন। তাঁর মাসী ইসাবেলা উলিয়মসন স্কটল্যাণ্ড থেকে তাঁদের সঙ্গেই আমেরিকায় এসেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনিই মাতৃহারা সন্তানদের লালন-পালনের ভার গ্রহণ করলেন এবং দৃশ্যতঃ

সে দায়িত্ব পালনও করলেন কৃতকার্য্যতার সঙ্গে। রেভারেণ্ড টমাস ক্যানাডায় একটা 'কংগ্রিগেশ্যান' অর্থাৎ ধর্মমণ্ডলী গঠন করতে চেষ্টা করে ব্যর্থমনোরথ হবার পর ওহিওয় আসেন এবং চিলিকোথে বসবাস স্থাপন করেন। সেখানকার প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জায় তিনি প্যাস্টরের কাজ করেন প্রায় বার বছর ধরে।

ঠিক এই সময়ে তাঁর কন্যা জেসীর সঙ্গে যোসেফ রুগ্‌লস উইলসনের আলাপ হয়। জেসী তখন ষ্টুবেন ভিলের নারীশিক্ষাসদনের ছাত্রী এবং জোসেফ উইলসন তখন ষ্টুবেনভিল্ অ্যাকাডেমীতে শিক্ষকতা করছেন এবং প্রতীক্ষা করছেন প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জায় যাজক রূপে নিযুক্ত হবার বাহালী পরোয়ানার জন্য। উভয়ের মধ্যে পরিণয়-পূর্ব্ববর্ত্তী-কালীন আলাপ-পরিচয় চললো দু'বছর ধরে। তার পর ১৮৪৯ সালের ৭ই জুন তারিখে তাঁদের প্রণয় পরিণয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করলো, পৌরোহিত্য করলেন কন্যার পিতা স্বয়ং। রেভারেণ্ড জোসেফের কাছে প্যাষ্টরের কাজ করবার জন্য প্রথম আহ্বান এলো পেন্‌সিলভেনিয়ার অন্তর্গত চার্টিয়ার্সের গীর্জা থেকে। তার কিছুদিন পরেই ১৮৫৫ সালে ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত ষ্টনটনের প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জা থেকে প্যাষ্টরের পদের জন্য তাঁর কাছে ডাক আসে। ভার্জিনিয়ার পুরাণে সহরগুলোর মধ্যে ষ্টাউনটন অন্যতম। আচার-ব্যবহারের দিক থেকে ষ্টাউনটন পুরোদস্তুর দক্ষিণী। তার নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে এবং সেই ইতিহাসের পরিধি ঔপনিবেশিক আমল অবধি প্রসারিত। উইলসন দম্পতি দুই কন্যা সহ ম্যান্সে এসে বসবাস স্থাপন করলেন এবং ১৮৫৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে এই ম্যান্সেই তাঁদের প্রথম পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। মাতামহের নাম অনুযায়ী ছেলের নাম করণ হ'ল টমাস উড্রো।

টমী যখন চার মাসের শিশু তাঁর মা তখনকার বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে॥ "ছেলে হয়েছে বটে একটা! যেমন মোটা-সোটা তেমনি স্বাস্থ্যবান। কোথায় লাগে তার কাছে আর দুই বোন!" টমীর দাদামশাইকে যখনই তিনি চিঠি দিতেন তখনই লিখতেন, তাঁর শিশুপুত্রকে যে দেখে সেই বলে 'চমৎকার ছেলে'! ডক্টর উড্রোর মতে, "ছেলে যে কেবল মোটা-সোটা তাই নয়, তার চেহারাতে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে যে, জেনারেল এসেম্‌ব্লীর মডারেটার হওয়া তাকে বেশ মানায়।"

তখনকার দিনে ছোট-খাটো ধর্মীয় এলাকার যে সব যাজক অধিকতর আর্থিক সাচ্ছল্য লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, সাধারণতঃ এক শহরথেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাঁদের স্বভাব। টমীর বয়স যখন এক বছর, তখন তাঁর পিতা সপরিবারে ভার্জিনিয়া ছেড়ে জর্জিয়ার অন্তর্গত আগষ্টায় চলে যান এবং সেখানে গিয়ে প্রথম প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের প্যাষ্টরর পদে নিযুক্ত হন।

শিশুর সুকুমার মনের উপর ঘটনার ছাপের প্রথম লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় ম্যান্স থেকে চার বছর বয়স্ক টমী একদিন বাড়ীর ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে রাস্তা দিয়ে একটা লোক চিৎকার করে বলতে বলতে যাচ্ছিল 'মিঃ লিঙ্কন নির্বাচিত হয়েছেন, যুদ্ধ বাধলো বলে'। ১৯০৯ সালে এব্রাহাম লিঙ্কন সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে সেদিনের সেই ঘটনার উল্লেখ করে উইলসন বলেন, 'আমার আজও বেশ মনে পড়ে লোকটার আবেগ ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত কণ্ঠস্বর শুনে বাবার কাছে ছুটে গিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, লোকটা কি বলছে'!

তার পর দীর্ঘ চার বৎসর ধরে দক্ষিণ আমেরিকাকে যুদ্ধের যে তীব্র উত্তাপ ও উত্তেজনা সহ্য করতে হয় তা অভূতপূর্ব। দক্ষিণীদের প্রতি উইলসন পরিবার ছিলেন আন্তরিক সহানুভূতি সম্পন্ন এবং সেই হিসেবে তাঁদেরও কাল কাটাতে হয় যুদ্ধ জনিত এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেই। সেই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে সেদিন যে সব ঘটনা চারদিকে ঘটে, সে সম্পর্কে তাঁর মত বিকৃত করতে পারে এমন কোন উপদলীয় সংস্কারের লেশ পর্যন্ত টমীর স্মৃতিতে ছিল না। অনেককাল পরে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন, যখন তিনি নিতান্ত বালক মাত্র, তখন একদিন বালকোচিত গর্ব্বের সঙ্গে তিনি রবার্টই, লীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং বিখ্যাত সেই যোদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে। আর একবার তিনি দেখেন, একদল সৈন্যের পাহারায় জেফারসন ডেভিস ও আলেকজাণ্ডার ষ্টিফেন্সকে উত্তরের এক কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গুরুগম্ভীর এই সব ঘটনার মধ্যে এমন একটা নাটকীয় প্রভাব ছিল যা যে কোন বালকের সুকুমার মনের উপর অনপনেয় রেখায় মুদ্রিত না হয়ে পারে না। টমীর মন থেকেও এ সব ঘটনার ছাপ কোন দিনই মুছে যায় নি।

দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী বলে পরিচয় দিতে তিনি সারাজীবন গর্ব্ব বোধ করতেন, কিন্তু তাই বলে গৃহযুদ্ধ জনিত বৈরীভাব তিনি মনে মনে পোষণ করতেন না। যে পারিবারিক ও স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর বাল্যকাল যে পরিবেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল তিনি জোর দিতেন তারই উপরে। তিনি মুক্তকণ্ঠে এ কথা স্বীকার করতেন যে, 'বার বার তিনি এ কথা বলে এসেছেন যে, সারাদেশের মধ্যে, এমন কি, সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকাই একমাত্র স্থান যেখানে কোন কিছুই আমার কাছে ব্যাখ্যাত হবার অপেক্ষা রাখে না'।

অগষ্টার উইলসন পরিবারের সমগ্র গৃহ পরিবেশ ব্যেপে বিরাজ করতো বিদ্যাবত্তা এবং অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনের উপযোগী একটা অনুকূল পরিবেশ। তা'হলেও বালক টমীর চোখে-মুখে একটা মর্যাদা বোধের চিহ্ন থাকা সত্ত্বেও লেখা পড়ার ব্যাপারে এমন কোন উৎকর্ষ ছিল না যা তার বয়সের পক্ষে অতিরিক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। মাথায় বুদ্ধি যদি সাধারণ ছেলেদের চেয়ে বেশী থেকেও থাকে, অন্ততঃ বাল্যকালে সে বুদ্ধির বিশেষ কোন বিকাশ দেখা যায় নি।

ডিকেন্স ছিলেন তখনকার দিনের জনপ্রিয় সাহিত্যিক। ডক্টর উইলসন ডিকেন্সের গ্রন্থ পাঠ করে পরিজনবর্গের চিত্ত বিনোদন করতেন। তারই মাঝে মাঝে অনুপ্রবেশ চলতো স্কটের উপন্যাস ও কুপারের কাহিনীর রাজ্যেও। টমীর পিতার কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার এবং গ্রন্থের মধ্যে হাসি ও কান্নার যে সব ভাবাবেগ নিহিত থাকতো, পড়বার সময় তাকে ভাব অভিব্যক্তির মাধ্যমে কণ্ঠে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে তাঁর কুশলতাও ছিল অনন্য-সাধারণ। তাঁর পুত্র মন দিয়ে সে পাঠ শুনতো এবং উপভোগও করতো, কিন্তু বইয়ের দুই মলাটের মাঝখানে যে প্রেরণা যে আনন্দ আবদ্ধ হয়ে থাকতো, তার উপলব্ধি তার পক্ষে সম্ভব হল তখনই যখন বয়স বাল্যের সীমা অতিক্রান্ত প্রায়। অলস এবং অনগ্রসর এই ছিল তখন তার পরিচয়। উড্রো এবং উইলসন পরিবার পুরুষানুক্রমে যে প্রখরবুদ্ধি দীপ্তির অধিকারী, তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে অন্যত্র বিক্ষিপ্ত হয়েছিল কেবল এই বালকের বেলায়। নয় বছর বয়সে তার প্রথম বর্ণপরিচয় হয়। এগার বছর বয়সে কোন ক্রমে সে বই পড়তে পারত। সব প্রথম যে বইখানা তার হাতে আসে সেটি হল

আমেরিকার জীবন-চরিতমালার মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থ পার্সন উইম্‌সের লেখা ওয়াশিংটনের জীবনী।

পাবলিক স্কুলের পাঠ্যক্রম ও নিয়ম শৃঙ্খলা টমীর জন্য নয়। দৈহিক দিক দিয়ে সে দুর্ব্বল, ভগ্নস্বাস্থ্য ও অনিশ্চিত। সেই বয়সেই তার চোখে থাকতো চশমা। এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও তার সংগঠন শক্তির অভাব ছিল না। পরিচিত বালকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সে গড়ে তুলতো সমাজসেবা ও শরীর চর্চাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান, এইভাবে সে 'লাইট ফুট ক্লাব' নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করে। যদিও বেস্‌-বল নিয়েই সে ক্লাবের আসল কারবার, তথাপি আইন-কানুনের মাধ্যমে টমী তাকে গড়ে তুললো পার্লামেণ্টারী বিতর্ক সভারূপে, বেস্‌-বল বিভাগ এবং বিতর্কবিভাগ এই উভয় বিভাগেরই প্রেসিডেণ্ট টমী। সে নিজে খুব ভালো খেলোয়াড় না হলেও, তার সুযোগ্য শিক্ষকতার গুণে লাইট ফুট ক্লাব পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য শহর ও গ্রামের বহু দলকে বেস্‌-বল খেলায় পরাজিত করার গৌরব অর্জন করতে সমর্থ হয়।

খেলার ধূলোর দিকে ঝোঁক একটু বেশী থাকার দরুণই সম্ভবতঃ টমীর বর্ণপরিচয় ও লেখাপড়া শিখতে এতো বিলম্ব হয়। কিন্তু এই সব ছেলেদের সাহচর্য, তাদের সংগঠন এবং বেস্‌-বল খেলায় তাদের বিজয় অর্জনের পক্ষে নিজের অবদান টমীর চরিত্রের উপর একটা স্থায়ী ছাপ অঙ্কিত করে রেখে যায়। ছাত্র হিসেবে যে সব বেসরকারী বিদ্যালয়ে বালক টমী প্রেরিত হয়, সেইখানেই যথারীতি ইস্কুলী-শিক্ষা লাভের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। আর গঠনের কাজ যখন চলছে, সেই সময়ে মনকে বিকশিত করে তোলার কার্যে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছিলেন তার পিতা।

রেভারেণ্ড ডাক্তার উইলসনের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ধারণা প্রচলিত রীতি-নীতির কোন ধার ধারতো না। তরুণের মন তাঁর কাছে এমন কোন সম্ভাব্য বিশ্বকোষ বলে বিবেচিত হত না, যার পাতায় পৃথিবীর যাবতীয় তত্ত্ব লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে ভাবীকালের জ্ঞান-ভাণ্ডার রূপে। তিনি টমীকে বলতেন, 'বুঝলে টমী, মন চোঙের মত একটা বস্তু নয় যে, বিশ্বের যত কিছু কুড়িয়ে এনে তার মধ্যে ভরে রাখবে।' বিজ্ঞান, পুরাতন ও আধুনিক সাহিত্য এ সব বুদ্ধিতে শান দেবার পাথর মাত্র, চিন্তার ক্ষেত্রে অপরিবর্ত্তনীয় উপকরণ নয়। পিতা-পুত্র একই সঙ্গে গ্রন্থের মধ্যে ডুবে যেতেন, একই সঙ্গে ভ্রমণ

করতে করতে প্রতিদিন লক্ষ্য করতেন প্রকৃতির মন ও মেজাজ, খুসি ও খেয়ালের খেলা। সেগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ জনিত বিপুল আনন্দ যে অপূর্ব্ব বর্ণ বিভায় বিচ্ছুরিত হয়ে পড়তো, সচরাচর বিদ্যালয়ের নীরেট গদ্যের আবহাওয়ার তা ধারণার অতীত।

উড্রো এবং উইলসন পরিবারের অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি ছিল এই প্রকার। প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমতের উপর তাঁদের আস্থা ছিল যেমন প্রগাঢ়, শিক্ষক হিসাবে মৌলিক ও সূক্ষ্ম চিন্তাধারার প্রতি তাঁদের অনুরাগও ছিল তেমনি অগাধ। শিক্ষার বাঁধা-ধরা পথই যদিও তাঁরা অনুসরণ করতেন, তথাপি যখনই নূতন কোন তত্ত্ব আভাসে ও ইঙ্গিতে তাঁদের আহ্বান জানাতো, তত্ত্বের ছদ্মবেশ যত আধুনিকই হোক না কেন, সেই মুহূর্ত্তে প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করে নূতন পথে পা বাড়াতে তাঁরা ইতস্ততঃ করতেন না।

নবজীবনের এই উন্মেষক্ষণে যে চাঞ্চল্য আমেরিকার জন-জীবনের একটা বিরাট অংশকে আলোড়িত করে তোলে, তার প্রভাব হতে উইলসন পরিবার নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে নি। প্রথমে নিউইয়র্কে বাসা বাঁধবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেন, তার পর স্থায়ী বসবাস স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁরা উপস্থিত হন ওহিওতে। ওই পরিবারেরই একটি শাখা ডাঃ জোসেফ রুগলস উইলসনের নেতৃত্বে সেখান থেকে চলে আসেন ভার্জিনিয়ায় এবং সেখানে বাসও করেন কয়েক বছরের জন্য। ষ্টানটনের পরে "শান্তি ও সুপ্তিমগ্ন" আগষ্টার মাস্সের স্নেহ-নীড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন উইলসন পরিবার। সেখানে বারো বছর বাস করবার পর তাঁরা চলে যান দক্ষিণ ক্যারোলাইক কলাম্বিয়াতে।

ডক্টর উইলসন এতদিন যত যায়গায় প্যাষ্টরের কাজ করে এসেছেন কলম্বিয়ার পদটি সকলের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য একটা সেমিনার ছিল, কাজেই নবাগত প্যাষ্টরের বাগ্মীতা ও বিদ্যাবত্তা উপলব্ধি করবার মত লোকও সেখানে ছিলেন বহু। টমী লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হয়ে ওঠেন জ্ঞানানুশীলনের এই পরিবেশের মধ্যেই। জীবনের যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতদিন সুপ্ত হয়েছিল, অনুকূল পরিবেশের স্পর্শে তা জেগে উঠতে লাগলো তন্দ্রার মোহঘোর হতে। টমীর বয়স যখন ষোল বছর, সেই সময়ে পারিবারিক ডেস্কের উপর ঝোলানো একটি ছবির দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে তাঁর এক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে তিনি বলেন, "উনি গ্ল্যাডষ্টোন

বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতি বিশারদ! আমিও চাই রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হতে।"

বাল্যের সীমা তখন তিনি অতিক্রম করে এসেছেন এবং আরব্যোপন্যাসের স্বপ্নের মত তাঁর সামনে তখন জেগে উঠছে যৌবন। গীর্জা কিম্বা মেঠো বক্তৃতার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের নেতৃত্বই তাঁর কাছে একমাত্র কামনার ও সাধনার সামগ্রী। তাঁকে হতে হবে গ্ল্যাডষ্টোন—যাঁর অঙ্গুলি হেলনে ঘটবে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন। গ্রীক শব্দরূপ অনিচ্ছুক কণ্ঠে গলাধঃকরণ করার, ধর্মতত্ত্বের চুল-চেরা বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবার যে পারিবারিক ঐতিহ্যের তিনি উত্তরাধিকারী তাঁর এই স্বপ্ন তার চেয়ে কতো মধুর কতো মনোহর।

কিন্তু গ্ল্যাডষ্টোনের আদর্শের কাছাকাছি পৌছোতে হলেও তার পূর্ব্বে অনেক কিছু করা দরকার। দু'বছরের মধ্যেই তাঁদের পরিবার স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। এবার তাঁদের গন্তব্য স্থান ডিলাওয়ারের অন্তর্গত উইল্‌মিংটন। এদিকে টমী গিয়ে উত্তর ক্যারোলাইবার অন্তর্গত শ্যারলটের ড্যাভিডসন্ কলেজে ভর্ত্তি হল। ডাঃ উইলসনএই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ট্রাস্টী, কাজেই এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল একান্ত ভাবে প্রেসবিটেরিয়ান ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে, টমী ড্যাভিডসন কলেজে এমন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি—যার ফলে সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তিসম্পন্ন ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে উন্নততর ছাত্র রূপে তাকে গণ্য করা যায়। তার বাবার শিক্ষকতা চরিত্র-গঠনের দিক থেকে চমৎকার ফলপ্রসূ হয়েছিল বটে, কিন্তু কলেজ সাধারণতঃ যে ধরণের কৃতিত্ব ছাত্রদের কাছ থেকে দাবি ক'রে থাকে তা পূরণ করার পক্ষে তা আদৌ কার্যকরী হয় নি।

তাছাড়া, টমীর ভগ্নস্বাস্থ্য ছিল এ পথে একটা বিষম অন্তরায়। বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকা এবং অধ্যাপকের বক্তব্য বিষয়ের নোট নেওয়ার পরিশ্রম তার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হ'ত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বেস-বল খেলার অভ্যাস সে ছাড়ে নি। সে খেলতো সেণ্টারে এবং ব্যাট্‌স ম্যান হিসাবেও একটা চলনসই রকমের খ্যাতি সে অর্জন করে। অন্যান্য ছাত্রেরা বলতো, টমী যদি এ রকম অলস প্রকৃতির ছেলে না হ'ত তা'হলে সে যে একটা ভালো খেলোয়াড় হতে পারতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পক্ষে প্রধান

আকর্ষণের বস্তু বলতে না ছিল ক্লাসরুম, না ছিল খেলার মাঠ। তার সমস্ত আকর্ষণ যেয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বিতর্কসভার মধ্যে। 'লিঙ্কনের মৃত্যু কি দক্ষিণ-আমেরিকার পক্ষে কল্যাণকর?' উইলকেস বুথ কি দেশ প্রেমিক ছিলেন? তখনকার দিনে ছেলেদের আলোচ্য বিষয় বস্তু ছিল এই সব প্রশ্ন। একবার বিতর্ক হয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব নিয়ে: 'শাসন পদ্ধতি হিসেবে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র অপেক্ষা প্রজাতন্ত্র উৎকৃষ্টতর।' প্রস্তাবের নঞাত্মক দিক সমর্থন করে টমীর বিতর্কে প্রথম অংশ গ্রহণ।

স্বাস্থ্যহীনতার দরুণ টমীর ডেভিডসন কলেজ জীবনে অকালে ছেদ পড়ে যায়। এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয় উইলমিংটনে। আরোগ্য লাভের পর ১৮৭৫ সালে সে ভর্তি হয় প্রিন্সটন কলেজে। সে সময়ে কলেজবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ডক্টর ম্যাক্‌কশ। সে সময় যে তুমুল বিতর্কে সারা দেশটা তোলপাড় হচ্ছিল তাতে তিনি বিবর্ত্তনবাদের পক্ষ গ্রহণ করেন এবং সে ব্যাপারে ডাক্তার উইলসন এবং তাঁর পুত্রের আন্তরিক সমর্থন তিনি লাভ করেন।

টমী এতদিন পর্যন্ত বিত্থার্জনের এবং করিৎকর্মা লোকদের সাহচর্য লাভের যে সুযোগ পেয়ে এসেছে, প্রিন্সটনে এসে তার পরিধি আরও সম্প্রসারিত হল। এখানে এসেও তার খেলা ধুলার প্রতি সক্রিয় আগ্রহে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। নিজের নীরস অথচ নিতান্ত প্রিয় বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করে বসে ইংরেজ লেখক বেজহটকে। রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে এই লেখকের অভিমত তার নিজের চিন্তাধারা গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

প্রিন্সটনে অবস্থিতির দ্বিতীয় বৎসরে সে নিজের বাবাকে যে চিঠি লেখে তারই মধ্যে নিহিত রয়ে যায় আর একটি আবিষ্কারের অস্তিত্ব। ডাক্তার উইলসনকে সে লেখে, "একটি প্রথম শ্রেণীর মনের আমি অধিকারী।" প্রিন্সটনে থাকা কালে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি যে সব অভিজ্ঞতা সে অর্জন করে, পত্রের অস্বাভাবিক ঘোষণা তার দ্বারা অর্থে ও তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। 'একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যদি কলেজে এসে থাকে তবে সে এই ছেলেটী'—এ কথা তারই জনৈক সহপাঠীর লিখিত স্বীকৃতি।

রাজনীতির প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কথা সে আগেই ঘোষণা ক'রে

রেখেছে। সে এ কথাও মনে মনে স্থির করে রেখেছে যে, যে-কণ্টকাকীর্ণ পথ বেয়ে রাষ্ট্রনায়কের আসনে আরোহণ করতে হয়, সে পথ সে অতিবাহন করবেই। প্রিন্সটনে থাকার প্রথম বছরেই রাজনীতির প্রতি তার আকর্ষণ যদি বিশেষ ভাবে বেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে উল্লিখিত ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা রূপে প্রতীয়মান হবে না। ১৮৭৬ সালে সে যখন দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য এক চাঞ্চল্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হয়: সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল রাদার ফোর্ড বি, হেয়েস এবং সামুয়েল জে' টিল্‌ডনের মধ্যে। অবশেষে হেয়েস যখন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন, সারাদেশের ডেমোক্রাটরা ক্রোধে ও উত্তেজনায় একেবারে ফেটে পড়লো। চারদিক থেকে চিৎকার উঠলো: "প্রবঞ্চনা—প্রতারণা! জনসাধারণ যাকে চায়, প্রেসিডেণ্টের আসন তার কাছ থেকে চুরি করে নেওয়া হয়েছে।" যাদের মাথা অতিমাত্রায় উত্তপ্ত তারা প্রকাশ্যে ব'লে বেড়াতে লাগলো যুদ্ধের কথা। মনে হল, শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিমূল পর্যন্ত বুঝি বা ভেঙ্গে পড়ে। রাজনীতির ইতিহাসে এ রকম বিপর্যয়ের দৃষ্টান্ত বিরল। টিল্‌ডেন অবশ্য অবস্থাটা শান্ত চিত্তে গ্রহণ করলেন, অত্যুৎসাহী সমর্থকদের সংযত করে তিনি হেসেই উড়িয়ে দিলেম আর একটা গৃহযুদ্ধের অমূলক আশঙ্কাকে এবং হেয়েস প্রেসিডেণ্টের কার্যভার হাতে তুলে নিলেন বিনা বাধায়। কিন্তু দেশকে যে পরিস্থিতি পার হয়ে আসতে হয়, প্রিন্সটন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রকে শাসনতন্ত্রগত সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে অনিবার্যরূপে এমন ভাবে ভাবিয়ে তুললো যে, সেরূপ ভাবনার অভিজ্ঞতা সে ইতিপূর্বে আর কোন দিন অর্জন করে নি।

তার মনে প্রশ্ন জাগলো: পূর্বপুরুষগণ যে আমেরিকান শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে রেখে গেছেন তা কি ত্রুটীহীন? সংবিধানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য যে ভাবে ব্যাখ্যাত হচ্ছে তা থেকে কি এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও সবচেয়ে গণতন্ত্র সম্মত পন্থা এইটাই? সে নিজেকে প্রশ্ন করে: তেমন বক্তার অভাব আজকাল কেন দেখা দিয়েছে যাঁর রাজনৈতিক মতবাদের বলিষ্ঠ ও বাগ্মীতাপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনে জন-সমুদ্র সমুদ্বেল হয়ে ওঠে? এই সব ক্ষুদে রাজনীতিকদের ক্ষুদ্রতার মধ্যে প্যাট্রিক হেনরী

ও ড্যানিয়েল ওয়েবষ্টারের মত লোক জন্মগ্রহণ করছে কই? অন্যান্য জাতির মধ্যে সে রকম বাগ্মীর তো কই অভাব নেই—জনমত গড়ে তুলতে যাঁরা সক্ষম? দৃষ্টান্ত স্বরূপ রয়েছেন গ্ল্যাডষ্টোন। বৃটিশ শাসনতন্ত্রের কল্যাণে অন্ততঃ এমন এক জন লোকের আবির্ভাবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্ট হওয়া সম্ভব হয়েছে যাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবে ও ঋজুগতিতে জনসাধারণের প্রাণে গিয়ে পৌঁছোয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যে পথে ভেসে চলেছে সেখানে সেরূপ পরিবেশ সৃষ্ট হওয়া কি সম্ভব? সরকারের সিদ্ধান্ত সমূহ যেখানে বাগ্মীতাপূর্ণ বিতর্কের মাধ্যমে গৃহীত না হয়ে, গৃহীত হয় খণ্ডিত ও বিকলাঙ্গ আকারে এবং গৃহীত হবার পর তাদের অর্পণ করা হয় কংগ্রেসের অন্তর্গত কমিটি সমূহের হাতে, সেখানে সবল ও সক্রিয় নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব?

কলেজের উচ্চতর শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে এই সব চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে টমীর লিখিত এক চমৎকার প্রবন্ধের মাধ্যমে। টমী তখন উড্রো উইলসন নাম ধারণ করেছেন এবং 'যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট' নামক সে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় লেখকের সেই নামেরই শিরোনামা বহন করে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'ইণ্টারন্যাশনাল রিভিউ' নামক যে পত্রিকায় হেনরী ক্যাবটলজ্ ছিলেন সে কাগজের সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম।

সেই বছরেই উইলসন বি, এ, পাশ করে প্রিন্সটন থেকে উইলমিংটনে ফিরে আসেন। পিতা সানন্দে ও সগর্বে পুত্রকে অভিনন্দিত করেন তার মৌলিক চিন্তাধারার জন্য. বিতর্ক সভায় তার দক্ষতার জন্য এবং সর্বোপরি, রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিত তার প্রবন্ধের জন্য। তৎসত্ত্বেও ডাক্তার উইলসনের ভাবাবেগ একেবারে অবিমিশ্র আনন্দময় ছিল না, বিষাদের একটা ক্ষীণ সুর বেজে উঠেছিল সে আনন্দের আবেগের মধ্যে। পুত্র রাজনীতিগত হোক, রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হোক ছেলে সম্বন্ধে এমন আশা ধর্মযাজক অন্তরে পোষণ করতেন না। তাঁর প্রিয় টমীর গোড়ার দিকে লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে তিনি নাকি বলেছিলেন, 'পুত্র আমার একান্ত কামনা ছিল, তোমার এই প্রতিভা নিয়ে তুমি ধর্মযাজকের জীবন গ্রহণ করবে'।

দুই

আইন ও বিবাহ

কলেজে প্রবেশ করবার কয়েক বছর আগে থেকেই উড্রো 'ভার্জিনিয়া থেকে আগত সিনেটার' রূপে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা করতেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তিনি নির্দ্ধারিত করে নিয়েছিলেন অভ্রান্ত রূপে।

প্রিন্সটনে থাকা কালে তিনি যে সব পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করেন তাও অঙ্গুলি নির্দেশ করে একই লক্ষ্যের অভিমুখে। ইতিহাস ও শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে গভীর তত্বজ্ঞান এবং বাগ্মীতা-দুর্লভ সে কাম্য বস্তু লাভের পক্ষে এই-গুলিই হবে তাঁর হাতিয়ার।

রাজনৈতিক সমস্যাসমূহ নিয়ে বিতর্কের ব্যাপারে তিনি যে কেবলমাত্র তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিকেই শানিত করে তুলেছিলেন তাই নয়, পরন্তু ডিমস্-থিনিসের অনুকরণে নিজের কণ্ঠস্বরকে তিনি মার্জিত করে তোলেন এবং তার ভেতরে যতখানি আবেগ ও আবেদন সঞ্চারিত করা সম্ভব তৎপ্রতিও যত্নবান হন। প্রিন্সটনে পটার্স ফিল্ডের আশ্রয়ে অথবা রবিবার ব্যতীত অন্যান্য

বারে উইলমিংটনে তাঁর পিতার নিজন গীর্জা ঘরে বসে তিনি বিশ্ববিশ্রুত সেই সব ভাষণের মহড়া দিতেন—ইতিহাস সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে যে গুলি একদা বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করেছে, দৈবক্রমে কেউ যদি কোন দিন ঐই সব উদাত্ত ভাষণ শুনে থাকে, সে নিশ্চয় মনে করে থাকবে ছেলেটা খেপে গেছে। লোকে কি মনে করছে বা না করছে সে দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না। কণ্ঠস্বর নিয়ে এই কসরতের আড়ালে আদর্শগত যে আন্তরিকতা ও আগ্রহ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, লোকে তার কোন আভাসই পেত না। তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলী অশরীরী ছায়া মূর্তি হলেও, তাঁর ভাষণের মধ্যে কিন্তু সারবত্তার অস্তিত্ব থাকতো।

এ ছেলে যে কালে বিশিষ্ট রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ হবে, জনমতের নায়ক ও ভার্জিনিয়ার সিনেটার হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! কিন্তু বাইশ বৎসর বয়স্ক এই তরুণ কলেজ গ্রাজুয়েট উচ্চতায় পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চির একটু উপরে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে শীর্ণ ও ক্ষিন্ন উইলমিংডনে স্বগৃহে ফিরে এসে দেখলেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপলব্ধি যতো কঠিন বলে মনে হয়েছিল বস্তুতঃ তা তার চেয়েও ঢের বেশী দুঃসাধ্য। 'ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকায় প্রকাশিত ক্যাবিনেট গভর্ণমেন্ট সংক্রান্ত প্রবন্ধ যে প্রতিষ্ঠা তাঁকে দিয়েছিল তা সত্ত্বেও তরুণ রাজনীতিকদের জন্য কোন চাহিদাই দেখা গেল না, অথচ শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তায় তাদের মগজ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। পৈতৃকবাসভূমি মানসে রাজনীতি অবিশ্বাস্যরূপে অপরিচিত বস্তু। দিগন্ত সীমা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষানুক্রমিক ধর্মযাজক ও শিক্ষকদের অফুরন্ত সারি। দৃষ্টিপথের অন্তরালে অবস্থিত ওই অদৃশ্য লোকে—যেখানে জাতিসমূহের নিয়তি নির্দ্ধারিত হয়, যবনিকা ভেদ করে সেখানে প্রবেশ করার জন্য এ ছাড়াও অন্য কোন অস্ত্রের প্রয়োজন।

আইন! আইনই সেই আবশ্যকীয় অস্ত্র। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে আগে আইনজীবী হওয়া চাই। রাজনীতিক মাত্রই আইনজীবী না হলেও, বহু আইনজীবীই যে রাজনীতিক, সেকালের ও এ কালের ইতি-হাসই তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কংগ্রেসের অনেক সদস্যই ব্যবহারাজীবী। আন্তরিক আগ্রহের বশবর্ত্তী হয়ে নয়, পরন্তু একটা মহান উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসেবেই উড্রো আইন ব্যবসায়কে বৃত্তিরূপে বরণ করে নিলেন।

এই লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই বৎসর অতিক্রান্ত হবার পূর্ব্বেই উড্রো ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন আইনের ছাত্র রূপে।

যে রাজ্যের লোক তিনি সেই রাজ্যে ফিরে আসা সুখদায়ক। জেফারসনের বাড়ী মন্টিসেলোতে এবং শ্যারলটভিলে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় মন্টিসেলো থেকে অনতি দূরে। তখনকার দিনে উইলসন ছিলেন ফেডারালিষ্ট মতবাদী, কাজেই জেফারসন মার্কিন গণতন্ত্রকে যে ভাবে ব্যাখ্যাত করতেন তার সঙ্গে তাঁর মত মিলতো না। শ্যারলট ভিলে তিনি যত দিন ছিলেন তার মধ্যে একবারের জন্যও তিনি মন্টিসেলোর ঐতিহাসিক সমাধি মন্দির দেখতে যান নি।

দক্ষিণীদের মনোভাবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল প্রগাঢ়। তাঁর চেয়েও প্রগাঢ়তর সহানুভূতি আর কেউ পোষণ করতো কিনা সন্দেহ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজ্যসমূহের সংযুক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস সহপাঠীগণকে বিস্মিত করে দিত। জন ব্রাইট সম্বন্ধে প্রদত্ত তাঁর একটি ভাষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সে ভাষণের একস্থানে তিনি বলেন, "দক্ষিণী রাজ্যগুলির সংযুক্তি প্রয়াস ব্যর্থ হওয়াতে আমি খুসি হয়েছি। যুক্তরাষ্ট্রকে দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন খণ্ডে বিভক্ত করা হলে তার ফলে দক্ষিণ-আমেরিকার ভাগ্যে যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটতো অতঃপর তিনি সবিস্তারে তা বিবৃত করেন। তাঁর এই মনোভাব নিঃসন্দেহে দক্ষিণী স্বার্থের প্রতিকূল। কিন্তু গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা যখন অদূরবর্ত্তী এমন কি সেই সঙ্কট সময়েও এইরূপ মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও উইলসনের ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে বন্ধুলাভ ঘটেছিল প্রচুর এবং তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক বন্ধুত্ব স্থায়িত্ব লাভ করেছিল তাঁর কর্ম্মজীবনের শেষ অবধি।

এই সময়েই উইলসনের জীবন প্রণয়ের প্রথম স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তাঁর খুড়তুতো বোন:হ্যারিয়েট উড্রো তখন তাঁর বাসভূমি ষ্টানটন সহরের অগষ্টা নারীশিক্ষাসদনের ছাত্রী। ষ্টানটন ও শ্যারলটভিলের মাঝখানে যদিও একটা পাহাড়ের ব্যবধান তবু পর্ব্বত লঙ্ঘন উইলসনের কাছে খুব বেশী কষ্টসাধ্য ছিল না। অপূর্ব্ব সুন্দরী এই তরুণীর সঙ্গে তিনি একাধিকবার সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তরুণীর আত্মীয় স্বজন ওহিওর অন্তর্গত চিলিকোতে বাস করতেন। তরুণ উড্রো সহসা আবিষ্কার করে

বললেন যে, সেখানে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ছুটির দিনগুলি অতিবাহিত করা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। এমনি ধারা একটি সাক্ষাতের সময়েই উড্রো একদা হ্যারিয়েটের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসেন। তাঁর মনে নারীত্বের সমুদায় মাধুর্য মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল এই তরুণীর তনু দেহকে আশ্রয় করে। তাতে তরুণীর মন কিন্তু এতটুকু টললো না। ফলে প্রস্তাব নির্বন্ধাতিশয্যের সঙ্গে নিবেদিত হওয়া সত্ত্বেও, প্রত্যাখ্যাত হল এবং প্রেমের রোমাঞ্চ-নাটিকার উপর যবনিকা নেমে এলো এইখানেই।

সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল উড্রোর মনে, তাঁর শোণিতের সঙ্গে মেশানো ছিল স্কচ্-আইরিস চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই সে বৈশিষ্ট্য যে ধমনীর শোণিত স্রোতের মধ্যে আবর্ত্তিত হয়ে উঠবে তা আর আশ্চর্য কি! নিতান্ত নীরস ও গদ্যময় ঘটনার মধ্যেও রস সঞ্চার করবার এই ক্ষমতা রাজনৈতিক ইতিহাস ও আইনের এই গুরু-গম্ভীর ছাত্রকে সহপাঠী সমাজে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। দেহচর্চার দিক থেকে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল না যদিও, তবু দৈহিকশক্তি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় যখনই পদক বিতরণের ব্যবস্থা হ'ত, সে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ভার ন্যস্ত হ'ত তাঁর উপরে। সাফল্যের সঙ্গে সে অনুষ্ঠান পরিচালন করার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কোন ছাত্র ছিল না। যখনই সুযোগ হ'ত, সময়োপযোগী কবিতা রচনা করে সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলতেন।

তাঁর আনন্দঘন মূর্ত্তি, তাঁর রসোত্তীর্ণ বাক্‌বিভূতির অফুরন্ত সঞ্চয় এবং বাগ্মী হিসাবে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজজীবনে তাঁকে বিশিষ্ট স্থান দান করেছিল। কিন্তু একদিকে নিজের পড়া-শোনা এবং অন্যদিকে বাইরের এই সব কর্মতৎপরতা এই দ্বিবিধ ভার বহন করার পক্ষে তাঁর ক্ষীণ স্বাস্থ্য একেবারে অক্ষম ছিল। এই দোতরফা চাপে তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে পড়ে। ১৮৮০ সালের শেষের দিকে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে স্বগৃহ উইলমিংডনে ফিরে আসতে তিনি বাধ্য হন।

এর পর দেড় বৎসর কাল তিনি নিজে নিজেই আইন অধ্যয়ন করেন। শারলটভিলে থাকা কালে চিত্ত বিনোদনের উপযোগী সামগ্রীর তাঁর অভাব ছিল না। সেই বৈচিত্র্যময় জীবন থেকে বিদায় নিয়ে এসে তাঁকে

মনোনিবেশ করতে হ'ল এমন এক বিষয়ের অধ্যয়নে যার প্রতি অন্তরের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। সেই নিরানন্দময় জীবনে বিড়ম্বনা ছিল প্রচুর।

অধ্যয়ন শেষ হলে তিনি অ্যাটলাণ্টায় চলে গেলেন। অ্যাটলাণ্টা তখন উঠ্‌তি শহর, তিনি ভাবলেন, সেখানে গেলে আইনের পসার তিনি জমিয়ে তুলতে পারবেন। উইলসন জর্জিয়ার ভাবী রাজধানী অ্যাটলাণ্টাকে কার্য-ক্ষেত্ররূপে বেছে নিলেন কর্মোগুম ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে। সত্য কথা বলতে গেলে, অ্যাটলাণ্টার জনসংখ্যা এমন কিছু ছিল না যে, তা' নিয়ে গর্ব করা যেতে পারে। তার লোকসংখ্যা তখন ছিল সাঁইত্রিশ হাজারের কিছু বেশী! কিন্তু শিল্পোন্নয়নের দিক থেকে বিচার করলে সুনিশ্চিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না যে, আজকের কর্মব্যস্ত এই নগরী একদিন নয়া দক্ষিণের প্রধান কর্মকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠবেই। সুচতুর আইনজ্ঞের পক্ষে বিরাট পসার জমিয়ে তোলার সমূহ সম্ভাবনা এর মধ্যে বিগুমান।

উইলসন আর কালক্ষেপ করলেন না। ভার্জিনিয়া বিশ্ববিগ্যালয়ের আর একজন ছাত্র ই, জে, রেণিক সেই শহরেই থাকতেন সেই একই ব্যবসা ব্যপদেশে। দুজনের মনেই সমান উৎসাহ, একই আদর্শের অনুপ্রাণনা দুজনের অন্তরেই, কাজেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠ্‌তে বিলম্ব হল না। 'রেণিক অ্যাণ্ড উইলসন, অ্যাটর্নীজ অ্যাটল, অ্যাটলাণ্টা, জর্জিয়া' এই নামে অচিরে এক যৌথ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। তাঁদের কারবারের সাইনবোর্ড ঝুলতো ম্যারিয়েট্টা ষ্ট্রীটের বাড়ীর দোতলায় দশ নম্বর ঘরের বাইরে অনেক উঁচুতে।

মক্কেলের ভীড় যে ভাবে জমে উঠবে বলে আশা হয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক সেই আকারে জমে উঠলো না, তা না উঠলেও, উভয়েই নিমগ্ন হ'য়ে গেলেন রাজনৈতিক সমস্যা সমূহের সমাধান চিন্তায়। সে ব্যবসাতে আয় না থাকলেও, আনন্দ ছিল প্রচুর। সে আলোচনায় ব্লাকষ্টোনের চেয়ে বেজ-হটের মধ্যেই আনন্দের উপাদান পাওয়া যেত বেশী। বিদেশজাত জিনিসের উপরে অত্যধিক পরিমাণ শুল্ক ধার্য করার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে খতিয়ান সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়ে

একট্যারিফ কমিশন এসে হাজির হল অ্যাটলাণ্টায়। যৌবনোচিত উৎসাহে উদ্দীপিত হ'য়ে উইলসন কমিশনের এক প্রকাণ্ড শুনানীর ক্ষেত্রে করবর্জিত ব্যবসার পক্ষ সমর্থন করতে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথায় যে সব যুক্তি ভীড় করে জমে উঠেছে, তারই সাহায্যে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষিত করার নীতি নস্যাৎ করে দেবার জন্য তিনি উদ্যত হলেন।

তিনি বললেন, "আমি বলতে চাই, উৎপাদকদের কাণে কাণে যদি বলা হয়, 'তোমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার দরকার নেই, সরকার তোমাদের জন্য ফেলি পেতে বসে আছেন,' তা'হলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা কোন দিনই বাড়বে না। তার চেয়ে নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে তাদের যদি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে দেওয়া হয়, তাহলে দক্ষতর উৎপাদন ক্ষমতার তারা অধিকারী হতে পারবে।"

আপনি কি শুল্কনীতি আমূল বাতিল করার পক্ষে ওকালতী করছেন? কমিশনের জনৈক সদস্য প্রশ্ন করলেন।

তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাস্যের জবাব এলো "হ্যাঁ দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রচিত সমুদায় শুল্কনীতি প্রত্যাহারের আমি পক্ষপাতী। শুল্ক ধার্য হোক শুধু রাজস্বের জন্যে।"

'নিউইয়র্ক ওয়ার্লড' নামক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওয়ালটার হাইন্স পেজ নামক জনৈক সাংবাদিক কমিশনের সহগামী ছিলেন। উইলসনের উচ্ছ্বসিত আবেগ দেখে তিনি প্রীতিলাভ করলেন, কেবল তাই নয়, উইলসনের উক্তি তাঁর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক বিশ্বাসকে আরও জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুললো। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো দুজনের মধ্যে। শুল্ক-সংক্রান্ত বিতর্কের প্রতিধ্বনি বাতাসে বিলীন হয়ে যাবার পূর্বেই একই ভাবের ভাবুক অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের এবং বিশেষ করে পেজের সহায়তায় উইলসন নিউইয়র্ক ফ্রী-ট্রেড গ্রুপের এক শাখা স্থাপন করলেন অ্যাটলাণ্টায়। বিতর্ক সভা হিসেবে শাখাটি সাফল্যমণ্ডিত হল বটে, তবে যে 'রেণিক এণ্ড উইলসন' নামক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটি মাত্র কক্ষে শাখাটি স্থান লাভ করে—সে প্রতিষ্ঠানটি কিন্তু তখন পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে মক্কেলদের পথ চেয়ে।

১৮৮২ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে উইলসন বারে যোগদান করেন, তার ফলে জর্জিয়ায় আইন ব্যবসা আরম্ভ করবার অনুমতি তিনি লাভ করলেন। পরে অবশ্য সে অনুমতির পরিধি বিস্তার লাভ করে ফেডারেল কোর্ট অবধি। কিন্তু তা'সত্ত্বেও এই সব আইনগত সুখ-সুবিধা কি রাজ্যে, কি সমগ্র দেশে কোথাও 'রেণিক এণ্ড উইলসন' ফার্মের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হল না। সে তখন পর্যন্ত মক্কেলের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে, কিন্তু কোন দিন একটি মক্কেলও তার ঘরের দরজা মাড়ায় না। লোকে অ্যাটলাণ্টা সম্বন্ধে যা বলে সবই ঠিক: অ্যাটলাণ্টা উঠ্তি শহর, বাড়ন্ত শহর, প্রাণবন্ত শহর, বহু রেলরাস্তার কেন্দ্রস্থল; কিন্তু এও ঠিক যে, উকিলের ভীড় সেখানে অপর্যাপ্ত। যে ভীড় সেখানে জমেছে তার অর্ধেকের জন্যও স্থান সঙ্কুলান হওয়া সেখানে অসম্ভব। বৎসর ব্যাপী নিস্ফল প্রতীক্ষার পর, ছোট তরফের অংশীদারের ভাষায় বলতে গেলে, ১৮৮৩ সালের বসন্তকালে 'রেণিক এণ্ড উইলসন' ভগ্ন আশার ছিন্নপতাকা কাঁধে তুলে নিয়ে জীবন পথের হতভাগ্য অভিযাত্রীদলের সঙ্গে ভীড়ে পড়লো।

অ্যাটলাণ্টায় অবস্থান কালের শেষের দিকে জননীর কার্যের ব্যপদেশে উড্রোকে নিকটবর্তী শহর রোমে চলে যেতে হয়। সেখানে তাঁকে পারিবারিক বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল। মিসেস্ উইলসন নিজের কাজ-কর্ম দেখবার ভার ন্যস্ত করলেন 'রেণিক এণ্ড উইলসন' নামক অ্যাটর্নী প্রতিষ্ঠানের হাতে। বলা বাহুল্য মিসেস্ উইলসনই হলেন সে প্রতিষ্ঠানের প্রথম ও একমাত্র মক্কেল। এরূপ ক্ষেত্রে সচরাচর যা ঘ'টে থাকে কাজটা এমন দায়িত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু তথাপি কার্যব্যপদেশে রোম পরিদর্শন তরুণ ব্যবহারাজীবীর জীবনে সব চেয়ে বড় রকমের ঘটনা।

তিনি লালিত-পালিত হয়ে উঠেছেন পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে। কাজেই প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জার রবিবারের প্রাতঃকালীন উপাসনায় তিনি যোগদান করলেন। রেভারেণ্ড ডক্টর অ্যাক্স্‌সন তখন সে গীর্জার ধর্ম যাজক। উপাসনা তখনও আরম্ভ হয় নি, এমন সময়ে অপেক্ষমান উড্রোর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল এক তরুণীর প্রতি। গীর্জার অভ্যন্তরে বিন্যস্ত আসন শ্রেণীর মাঝখান দিয়ে ধীর পদক্ষেপে তরুণীটি এগিয়ে আসছিল। তরুণী প্রায় তাঁরই সমবয়স্কা। গাঢ় কালো রং-এর পোষাক তাঁর পরিধানে এবং তাঁর হাত ধরে আছে

একটি শিশু। উড্রো স্বগত কণ্ঠে বললেন, 'সম্ভবতঃ বিধবা।' কাঞ্চন বর্ণাভ তাঁর কেশ গুচ্ছ, চোখ দুটি ঘন বাদামী রং-এর। পৃথিবীতে হয়তো এঁর চেয়েও সুন্দরী বহু তরুণী আছেন, কিন্তু এঁর মতনটি আর কোন দিন তাঁর চোখে পড়ে নি। এমন কি, খুড়তুতো বোন হ্যাটিও এঁর সঙ্গে তুলনীয়া নয়। তরুণীর দিকে তিনি চেয়ে রইলেন মন্ত্রমুগ্ধের মত। মার্লোর বিখ্যাত লাইন কয়টি তখন তাঁর মনে গুঞ্জন তুলেছে; প্রথম দর্শনেই প্রেম তা হলে একেই বলে। যে তরুণীটির রূপ উইলসনকে মুগ্ধ করছে, উপাসনা শেষ হলে তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি জানতে পারলেন তাঁরই এক আত্মীয়া মিসেস্ বোন্সের কাছ থেকে। উইলসন মনে মনে ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, তরুণীটি বিধবা, কিন্তু তা তিনি নন। গীর্জার ধর্মযাজকের কন্যা তিনি, তাঁর নাম এলেন লুইস অ্যাকস্‌সন।

উভয়ের মধ্যে দেখা-শোনা হল এবং তার পরই সুরু হল ম্যান্সে যাওয়া-আসা। এলেন অ্যাকস্‌সনের মাতৃবিয়োগ জনিত অশৌচ কাল তখনও শেষ হয় নি এবং ডক্টর অ্যাকস্‌সনের ছোট্ট সংসারের তিনিই তখন গৃহকর্ত্রী। অ্যাটলান্টার প্রেমিক ব্যবহারাজীবী কল্পনায় তরুণীকে যে ভাবে চিত্রিত করে তুলেছিলেন, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের পর তিনি দেখলেন যে, তার এক বর্ণও মিথ্যে তো নয়ই, বরঞ্চ কল্পনায় আঁকা চিত্রের চেয়েও তিনি আরও ঢের বেশী সুন্দর। সৌন্দর্যের সে সম্মোহ হতে মুক্ত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। এর আগে যে সব মহিলার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছে তাঁরা মহিলা মাত্র, নারী নন। কিন্তু সে কালেও এই তরুণীর মধ্যে বুদ্ধির প্রাখর্য্য ছিল আর ছিল সংস্কৃতির সম্পদ। দিনে দিনে এই তত্বটী তাঁর কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো যে, তাঁর নিজের অধীতবিদ্যার বিস্তারের চেয়ে তরুণীর অধ্যয়নের পরিধি বিস্তৃততর, তাঁর নিজের জ্ঞানগত কৌতূহলের চেয়ে তরুণীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা প্রবলতর। তরুণীর স্বভাব ছিল কিছুটা গুরু-গম্ভীর ধরণের। তাঁর সঙ্গিনীরা তাই তাঁকে বলতেন, পুরুষ-বিদ্বেষিণী। আর তিনি নিজে কৌতুক-প্রিয় এবং প্রেমের-মৃগয়ায় কৌতুহলী শিকার সন্ধানী। তিনি সর্ব্বদাই তরুণীর সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তৎপর। অন্তরের যে অব্যক্ত আকাঙ্খাকে ভাষা দেবার মতো কথা তিনি কোন দিন খুজে পান নি, তাকেই সঞ্জীবিত করে তুলবে সহানুভূতিসূচক যে সাড়াটুকু তাই মাত্র তাঁর কাম্য।

বৎসরকাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই তাঁরা আবদ্ধ হলেন বিবাহের অঙ্গীকারে। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ ব্যাপার যে শীঘ্র নিষ্পন্ন হবে তার কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না। মক্কেলহীন উকিল অ্যাটলান্টার আয়হীন ও উপার্জনহীন উপজীবিকা ছেড়ে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন এবং যোগদান করলেন এসে জন্স হপ্‌কিন্সে। মাথায় যদি আকাশ ভেঙে পড়ে তবু রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ হবার সঙ্কল্প হতে তিনি চুলমাত্র বিচলিত হবেন না।

স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্ত্তী হবার জন্য তিনি যে দরখাস্ত করেন, তাতে কথাটা ঠিক এই ভাবে না বললেও, বলেছিলেন প্রকারান্তরে। তিনি বললেন : ইতিহাস এবং রাজনীতি-বিজ্ঞানের শিক্ষক হবার উপযোগী যোগ্যতা অর্জনই আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের উদ্দেশ্য। তাছাড়া, আমার মানসিক অভিমুখীনতা সব সময়েই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধীয় ইতিহাসের দিকে, কাজেই সে বিষয়েও বিশেষ জ্ঞান লাভের সুযোগ অর্জনও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে যে সব কৃতিত্ব উইলসন অর্জন করেন এবং যে সব অপ্রিয় ঘটনার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়, জন্‌স হপ্‌কিন্সে তার অনেকগুলিরই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেখানে তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে বহু বন্ধু-বান্ধব চতুর্দিকথেকে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ান, তাঁর অপূর্ব বাগ্মীতার জন্য বিতর্ক সভা তাঁকে বরণ করে নেয় নেতা রূপে। তথাকার সাহিত্যসভাকে তিনি নূতন ভাবে পুনর্গঠিত করেন এবং তার জন্য রচনা করেন এক নূতন গঠনতন্ত্র। ফলে, সে প্রতিষ্ঠান অভিহিত হয় 'হপ্‌কিন্‌স হাউস অব্‌ কমন্‌স' এই নূতন আখ্যায়। এমন সময়ে তাঁর জীবন-আকাশে ঘনিয়ে উঠলো দুর্যোগের ঘনঘটা। অধ্যয়নের তপস্যায় অক্লান্ত পরিশ্রমের দরুণ তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং উইলমিংটনে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম জীবন যাপন করতে তিনি বাধ্য হন।

কিন্তু জন্‌স হপ্‌কিন্সের স্নাতক পাঠ্যক্রম তাঁর আর শেষ করা হল না। তাঁর প্রথম রচিত 'ক্যাবিনেট গভর্ণমেণ্ট' শীর্ষক প্রবন্ধে যে ভাব ও তত্ত্ব অন্তর্নিহিত ছিল, তা না পেল ধারাবাহিক অভিব্যক্তি, না লাভ করল যুক্তি সঙ্গত পরিণতি। যে বিষয়বস্তু তাঁর চিন্তা-জগতে গড়ে উঠেছে তাকে যদি তথ্য সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল অভিব্যক্তি দান করতে হয়, তা হলে তাকে গ্রন্থের

আকার দান করা দরকার। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়া সত্ত্বেও ছুটির মধ্যে উইলমিংটনের ম্যান্সে বসে তিনি গ্রন্থ রচনার কাজে ব্যাপৃত হলেন। আরব্ধ কার্য সমাপ্ত হয় জনস্ হপ্‌কিন্সে এবং হবামাত্র প্রকাশকের কাছে প্রেরিত হয় তার পাণ্ডুলিপি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায় তবু তাঁর সাহিত্যের সদ্যোজাত মানস-সন্তানের নিয়তি সম্বন্ধে কোন কথাই হতাশা পীড়িত গ্রন্থকারের কাণে আসে না। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সম্বলিত একখানি অতিশয় সংক্ষিপ্ত পত্র অবশেষে তাঁর হাতে এলো। হাউটন মিফলিন কোম্পানী গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার পক্ষে সম্মতি জানিয়েছেন। যে পারিশ্রমিক দিতে চাওয়া হয়েছে, তা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার রঙ্গীন প্রতিশ্রুতি বহন করে।

তাঁর লেখা কংগ্রেস্যনাল গভর্ণমেণ্ট নামক বইখানা প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে। এই ঘটনা উইলসনের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা সূচিত করে। যেরূপ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ইংলণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির তুলনা মূলক আলোচনা করা হয় বইখানাতে, ওই বিষয়ের ছাত্রদের পক্ষে তা দুর্লভ। গ্রন্থটি সমালোচকদের সপ্রশংস আলোচনার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয় এবং উইলসনকে খ্যাতির ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাজনৈতিক-ইতিহাসের চিন্তাশীল লেখক রূপে।

কংগ্রেস্যনাল গভর্ণমেণ্ট প্রকাশিত হবার পূর্বেই গ্রন্থকার জন্‌স হপকিন্স থেকে বৃত্তি হিসেবে পাঁচশত ডলার প্রাপ্ত হন। স্নাতকোত্তীর্ণ ছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সময়ে উইলসন বৃত্তির দরুণ এই টাকাটা দাবি করেছিলেন। যে আর্থিক অস্বচ্ছলতার সঙ্গে তিনি এতদিন সংগ্রাম করে আসছিলেন, এর ফলে তার কিছুটা উপশম হল। তাছাড়াও, শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কতগুলি সুখ-সুবিধার তিনি অধিকারী হলেন, ইতিপূর্বে যা তাঁর পক্ষে লভ্য ছিল না।

লেখক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার বাইরে। অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পক্ষথেকেও তাঁর কাছে ডাক আসতে লাগলো। ব্রীন মওয়ার সেই সব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। তারা তাঁকে দিতে চাইলো মাসিক পনর শ' ডলার বেতনে রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপকের পদ। তাঁর পকেটে তখন পাঁচশ ডলার মজুত, সম্মুখে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ সম্ভাবনা। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁর মনে হল, কোন কিছুই অসাধ্য

যা অসম্ভব নয়। দুবছর পূর্বে রোমের এক ছোট্ট গীর্জায় যে মেয়েটির সঙ্গে সাক্ষাত হয়, তাঁকে পত্নীরূপে পাবার ইচ্ছে তিনি তখন থেকেই অন্তরে পোষণ করে আসছিলেন। সে ইচ্ছা এখন সচ্ছন্দে পূরণ করা যেতে পারে। সেই স্মরণীয় ঘটনার পর তাঁদের মধ্যে যদিও দেখা-শোনা আর ঘটে নি, তবু উভয়ের মধ্যে পত্রের আদান-প্রদান চলে এসেছে নিয়মিত রূপে। প্রেমপত্রের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই পত্রগুলিও তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর করে দিয়েছিল এবং উভয়কে আবদ্ধ করেছিল পরস্পরের প্রতি প্রেমের নিগূঢ় বন্ধনে। এলেন অ্যাক্সন নিজের ভাইয়ের কাছে তাঁর সম্বন্ধে একদা এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই সব চেয়ে মহনীয় ও বরণীয় ব্যক্তি। তাঁর এই গর্বোজ্জ্বল ধারণা কখনও একদিনের জন্যও নিষ্প্রভ বা নিরস্ত হয় নি।

মাস্সের অন্তর্গত সাভানার স্বাধীন প্রেসবিটেরিয়ান গীর্জায় তাঁদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৮৮৫ সালের ২৪শে জুন তারিখে। উত্তর ক্যারোলাইনার আর্দেনে মধুচন্দ্র যাপন করবার পর তাঁরা ব্রীন মগ্নারে ফিরে এলেন এবং উইলসন ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলে তাঁরা সেইখানেই ঘর-কন্না পেতে বসলেন।

মেয়েদের অধ্যাপনার কাজ উইলসনের পছন্দসই নয়। তাঁর দৃষ্টিতে নারী গৃহকর্ত্রী, কাজেই ঘর-সংসার চালানো এবং সন্তান-সন্ততি পালনই তাঁদের মুখ্য কর্তব্য এবং উচ্চ-শিক্ষা তাঁদের পক্ষে নিতান্ত গৌণ বস্তু। সে যাই হোক, নিজের মনোমত বিষয়সমূহের অধ্যয়নের পক্ষে তিনি এখানে প্রচুর সুযোগ পান এবং সে কার্যে পত্নীর কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেন যথেষ্ট। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্রম-বিবর্তনের দিক থেকে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, এখানে অধ্যাপনা কালে 'পলিটিক্যাল সায়েন্স" নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করে তাকে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের অধীনে আনার বিরাট পরিকল্পনা ছায়াপাত করে এই প্রবন্ধটির মধ্যে। তাঁর পরিকল্পিত সে ফেডারেশনের স্বরূপ এই প্রকার:

প্রথমতঃ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মত বৃহদাকার সাম্রাজ্যগুলির অংশসমূহের মধ্যে এবং পরিশেষে খাস সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে সংযুক্তির অভিমুখীনতা আজ যদিও পরিলক্ষিত হচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে, তথাপি দিনে দিনে অভিমুখীনতা আরও স্পষ্ট, আরও বেগবান হয়ে উঠতে বাধ্য। ক্ষমতা কেন্দ্রায়ত্ত না করে, ব্যাপকতর সংযুক্তির মাধ্যমে সহনীয় ভাবে তাকে বিভক্ত ও বণ্টিত করে দিতে হবে। সে অভিমুখীনতা আমেরিকার ধাঁচে গড়া এই ধরণের ফেডারেশনের দিকে; বিশ্বের বিভিন্ন সরকারসমূহ এই ফেডারেশনে যুক্ত হবে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে। সংযুক্ত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সমতা স্থাপিত হবে, তা হবে অর্থনীতি নিরপেক্ষ, পরস্পরের মধ্যে যে নির্ভরতা স্বীকৃত হবে, তা হবে সম্মানজনক।

তিন

শিক্ষক ও বাগ্মী

উইলসনদম্পতি তাঁদের বিবাহের পর কয়েক বৎসর যাপন করেন গ্রীন স্কওয়ারের বিটুইনারী নামক একটি বাড়ীর উপরতলায়। আনন্দ-মুখর সে দিনগুলি, জীবন-আকাশে মেঘের লেশমাত্র তখন কোথাও ছিল না। কৃত-বিদ্য ও শ্রেণীবদ্ধ স্কচ পূর্বপুরুষগণের দীর্ঘ শোভাযাত্রা হয়তো ছিল না, হয় তো তাঁদের সম্মানে ছিল না বাদ্যভাণ্ডের আড়ম্বর। কিন্তু বংশগত ঐতিহ্যের ইতিহাস বহন করে ইতিহাসের এক অধ্যাপকের চিত্র: তাঁর চোখে চশমা, তাঁর ধমনীতে আইরিশ শোণিত ধারার চাঞ্চল্য, একটি রেশমী টুপি তাঁর মাথায় স্থাপিত নিতান্ত অগোছাল ভাবে, তন্দ্রালু তাঁর দুটি চোখ, দীর্ঘ পা দুখানা থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছে জিন নৃত্যের সঞ্চালন বেগে। কৌতুকে, পরিহাসে, মজাদার গল্পে ও অর্থহীন আবোল-তাবোল কবিতার আবৃত্তিতে বিটুইনারীর বাড়ীখানা সর্ব্বদা আনন্দোজ্জ্বল ও হাস্যমুখর থাকত। সে বাড়ীতে অতিথিঅভ্যাগত যাঁরা আসতেন, যাবার সময় মনে তাঁরা অনপনেয় রেখায় ও রঙে মুদ্রিত করে নিয়ে যেতেন একটি আদর্শ-সুখী-পরিবারের মনোরম চিত্র।

তাই বলে সব কিছুই অবিমিশ্র আনন্দ ও কৌতুকময় ছিল না। সে যাই হোক, বিবাহের পর থেকে উইলসনের জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ কল্পলোকের

এক নূতন রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। এমন একদিন ছিল যখন প্রিন্সটনের জনহীন প্রান্তরে তিনি একাকী ঘুরে বেড়িয়েছেন। এই সময়েই সুরু হয় তাঁর আত্মিকসত্তার ধীর-মন্থর বিকাশ। এই সময়ে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ছিল শেলীর কাব্যগ্রন্থ। তার মধ্যেই তিনি আহরণ করতেন নব নব তত্ত্ব ও সৌন্দর্যের সন্ধান, অন্তরের অনির্বাণ কৌতূহল ও জিজ্ঞাসাকে কবিতার যে ছত্রগুলি উদ্দীপিত করে তুলতো, তাঁর তত্ত্ব জিজ্ঞাসু মন অবগাহন করত তারই মধ্যে। 'ওড্ টুদি ওয়েষ্ট উইণ্ড' কবিতাটির আবৃত্তি যাঁরা তাঁর মুখ থেকে শুনেছেন, তাঁরা কোনদিন তা ভুলতে পারেন নি। একটা মহান আদর্শকে জীবনে উপলব্ধি করবার জন্য কবির মতই এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করতেন।

"নিখিল বিশ্ব মানবের মাঝে
ছড়াইয়া দাও এ বাণী মম
মনের সাধে,
তন্দ্রামগ্ন ধরার কর্ণে
বাজুক দৈববাণীর সম
তূর্যনাদে।"

টেবিলের উপর স্তূপীকৃত বই মাঝখানে রেখে স্বামী এবং স্ত্রী এইবারে আসন গ্রহণ করলেন দুই দিকে। স্বামীকে তাঁর গবেষণার কার্যে সাহায্য করবার জন্য পত্নী জার্মান ভাষা শিখতে সুরু করলেন। যে পরিকল্পনা, যে রাজনৈতিক দর্শন ধীরে ধীরে তাঁর মনোজগতে গড়ে উঠছে, তিনি সে-গুলি অকপটে তুলে ধরলেন স্ত্রীর সম্মুখে। যে বইগুলি তাঁর প্রিয় তাই নিয়ে আলোচনা চলে পত্নীর সঙ্গে এবং অধীতগ্রন্থের যে সব দুরূহতত্ত্ব এর আগে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছিল, এই আলোচনার মাধ্যমে সেগুলি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। কেশে কনকদ্যুতি সম্পন্ন এলেন যে সমস্ত দিক থেকে কেবল মাত্র সুচতুর গৃহিণীই ছিলেন তা নয়, পরন্তু তাঁর পড়া-শোনার পরিধি ছিল স্বামীর অধীতবিদ্যার বিস্তৃতি অপেক্ষা প্রশস্ততর। তা ছাড়াও, তাঁর ছিল চিত্রাঙ্কণের পটুতা। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যখন বাগদত্তা, নিউইয়র্কের আর্ট কলেজের তিনি তখন ছাত্রী। কাজেই, ইচ্ছে করলে নিজের জন্য তিনি একটা পৃথক পথ বেছে নিতে পারতেন।

সঙ্গীতবিদ্যায় স্বামীকে তিনি দীক্ষা দান করেন। স্বামীও তার প্রতিদানে পত্নীকে আনন্দ দান করতেন তাঁর সুললিত কণ্ঠের গান শুনিয়ে,- কখনও বা সুর মূর্চ্ছনায় কলোচ্ছ্বাসে তাঁকে জাগিয়ে তুলতেন; শান্ত গাম্ভীর্য থেকে। উড্রো, তুমি কি করছো জানো না—এলেন বলতেন প্রতিবাদের সুরে। উড্রো তার জবাবে বলতেন, 'মাননীয়া ভদ্রমহিলা, আপনি বলবার আগে পর্যন্ত আমি জানতাম না আমি কি করছি। এখন আপনার কথামত আমি নিজেকে সংশোধন করে নিচ্ছি।'

তাঁদের দাম্পত্য জীবন আনন্দময় সত্য, কিন্তু পারিবারিক পরিবেশের বাইবের জীবন যে ভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল তা এগোচ্ছিল না। প্রথমেই ধরা যাক, উড্রোর নিজের কাজ-কর্মের কথা। ক্রমেই এ ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হতে থাকে যে, কর্মক্ষেত্রে তাঁর সাধনা ব্যর্থ হতে চলেছে। তথ্য ও তত্ত্বের যে সম্ভার তিনি ছাত্রদেব হাতে তুলে দেন তা নিয়ে নিঃশব্দে ও গম্ভীর ভাবে তাঁরা নাড়া-চাড়া করে এবং তার পরে সেগুলো তাঁরই হাতে ফিরিয়ে দেয় পরীক্ষার উত্তরপত্রের মাধ্যমে। তাদের মনে সাড়া জাগাবার পক্ষে এই অক্ষমতা তাঁকে পীড়িত ও অধৈর্য করে তোলে। শিক্ষার উদ্দেশ্য তো তা নয়। শিক্ষা ছাত্রদের মনে শক্তি সঞ্চার করবে, তাকে আগ্রহী করে তুলবে আলোচনা ও তর্ক যুক্তির জন্য, সংক্ষেপে বলতে গেলে, জ্ঞানানুশীলনের প্রতিটি কর্মতৎপবতা সম্বন্ধে সজাগ ও সাগ্রহ হবার জন্য। 'মন তো তথ্য ও তত্ত্ব দিযে ঠেসে-ঠুসে ভরে তোলবার জন্য শূন্য একটা চোঙ নয়'—এই ছিল তাঁর অভিমত। নিছক তথ্যের প্রতি উইলসনের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। যে বিরাট স্বপ্ন তাব দৃষ্টির সম্মুখে জেগে রয়েছে, তথ্য আহরণের কার্যেই তা পর্যবসিত হবার নয়।

অন্যদিকে এলেনকেও অসুবিধাব সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিয়ের সময়ে বেতনের যে পরিমাণকে প্রচুর বলে মনে হয়েছিল, কার্য্যকালে দেখা গেল তা নিতান্ত নগণ্য। দক্ষিণী সুলভ অতিথিবৎসলতার বশে স্বজনদের জন্য তাঁরা গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁদের আদর অপ্যায়নে তাঁরা পরিতৃপ্তি লাভ করতেন বটে, কিন্তু তার দরুণ ব্যয়ভার বহন করা ক্রমেই তাঁদের পক্ষে হয়ে দাঁড়ালো এক জটিল সমস্যা। যে জার্মান বইখানা নিয়ে তাঁরা দুজনায় এক সঙ্গে পড়া শোনা করছিলেন, ১৮৮৬ সালের বসন্তকালে

তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল এবং এলেন ফিরে গেলেন জর্জিয়ায় তাঁ দের প্রথম সন্তান মারগারেটের জন্ম এইখানেই, কলেজে অধ্যাপনার জন্ত উড্রো স্ত্রীর সঙ্গে যেতে পারলেন না বটে, কিন্তু পত্নীর জন্ত তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত রইলো না।

কিন্তু তাই বলে তিনি হাত-পা গুটিয়ে চুপ করে বসে রইলেন না। তাঁর শারীরিক সামর্থ্য যদিও ছিল সীমিত, তবু ব্রীণ ময়ার তাঁর কর্মোত্তমের সবখানি আত্মস্থ করতে পারে নি। তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা তাকে তাড়িত করতো শক্তির শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত কাজে লাগাতে। কতো কাজই না এখন পর্যন্ত অসম্পন্ন রয়ে গেছে।

তিনি এমন একখানা বই লিখবার বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামলেন—যার মধ্যে থাকবে পৃথিবীর সকল দেশের শাসনতন্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা। কিন্তু এও তাঁর পক্ষে পর্যাপ্ত বলে মনে হল না। কন্তার জন্মের পর তিনি জন্স্ হপ্‌কিন্সে হাজির হন এবং সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'ডক্টর অব ফিলসফি' উপাধি লাভ করেন।

উইলসনের ব্রীণ মওয়ারে অবস্থান কালের শেষ বৎসর জন্ম এবং মৃত্যুর দ্বারা চিহ্নিত। অক্টোবর মাসে তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা জেসী উড্রো ভূমিষ্ঠ হয়। তার পরের এপ্রিল মাসেই খবর আসে উইলসনের আকস্মিক মাতৃবিয়োগের, মায়ের নামানুযায়ীই দ্বিতীয়া কন্তার নামকরণ হয়। এই সব ঘটনার অব্যবহিত পরেই ওয়েসলীয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে একটা ভালো মাইনের চাকরীর ডাক আসে।

মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে উইলসন নিজেকে অযোগ্য মনে করতেন এবং সে কাজটাও তাঁর কাছে মনে হোত এক বিরক্তিকর ব্যাপার, তৎসত্ত্বেও কুণ্ঠিত মন ও কম্পিত অন্তঃকরণ নিয়ে নিজের ছোট্ট পরিবার সহ তিনি কনেক্‌টিকাটের মিড্‌ল টাউন অভিমুখে যাত্রা করলেন। যে ঘরে তাঁরা জীবনে প্রথম নীড় বেঁধেছিলেন, সেখান থেকে উন্মূলিত হয়ে চলে যেতে তাঁদের কষ্ট পেতে হয়েছিল খুবই। তাঁদের এই দক্ষিণী সুলভ শিক্ষা-দীক্ষাও আচার আচরণ নিয়ে নিউ ইংলণ্ডের এক পল্লীগ্রামে নিজেদের কি নিতান্ত বৈদেশিক ও বৈরাগত বলে মনে হবে কিনা সে সম্বন্ধেও তাঁদের মনে সংশয় ছিল। অবশ্য পরে প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের সে আশঙ্কা একেবারে অমূলক।

মিডলটাউনে যে সুখ ও শান্তিময় জীবনের তাঁরা সন্ধান পেলেন, তেমন প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে ইতিপূর্বে তাঁদের কোনদিন পরিচয় ঘটে নি।

ওয়েসলীয়ানে যে দুটি বছর তাঁরা পরমশান্তিতে যাপন করেন, তাঁদের তৃতীয় সন্তান ইলিয়েনর বাগুলফ ভূমিষ্ঠ হয় সেই সময়েই। ব্রীণ মওর এসে যে বইখানার রচনা সুরু হয় তা লেখা শেষ হয় এই বছরেই এবং এই বছরেই তা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'রাষ্ট্র' (দি ষ্টেট) নামে'। রাজনৈতিক ইতিহাসের অক্লান্ত অধ্যবসায়শীল ছাত্র নতুন আর একখানি গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত করে এই পুস্তকটির সমাপ্তি উৎসব সম্পন্ন করেন। রচনার নেশা ছিল তাঁর শোণিতের সঙ্গে মেশানো। আন্তরিক সে আগ্রহ নিজেকে অভিব্যক্ত করবার উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ব্রীণ মওর অথবা ওয়েসলীয়ান অপেক্ষা প্রশস্ততর ক্ষেত্রের সন্ধান করছিল।

অবশেষে সে সুযোগ একদিন এসে পৌছোলে তাঁর জীবনে। প্রিন্সটনের যে কলেজের তিনি ছাত্র, ১৮৯০ সালে সেই কলেজেরই আইনের ও রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করবার জন্য তাঁর কাছে আহ্বান এলো। এখানে এসে তাঁর মনে হল, তিনি যেমনটি চাইছিলেন ঠিক তেমনি পরিবেশের মধ্যেই এসে পড়েছেন এবং ছাত্রদেরও বুঝতে বিলম্ব হল না যে, তাদের কলেজের দৈনন্দিন কর্মসূচীর মধ্যে এমন একটি জিনিসের আবির্ভাব ঘটেছে যা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অদৃষ্ট পূর্ব্ব। ছাত্রদের সপ্রশংস কৌতুহল তিনি জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হন সূচনা থেকেই। তাঁর বক্তৃতার ভাষা যেমন সচ্ছন্দ ও সাবলীল, বচনবিন্যাসের প্রসাদ গুণে তাঁর প্রকাশ ভঙ্গী তেমনি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট। তদুপরি যে ভাষণ প্রদত্ত হত সেই নিজস্ব নাটকীয় ভঙ্গীতে—বহুদিনের সাধনার দ্বারা যা তিনি আয়ত্ত ও অধিগত করেছেন। সে ভাষণ ভঙ্গী ছাত্রদের কাছে অভিনব তো বটেই, তা ছাড়াও তা আনন্দদায়ক। তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি ছাত্রদের মনে সাড়া জাগালো, তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করলো তুমুল বিতর্কের উত্তাপ ও উত্তেজনা। শিক্ষা তাঁর কাছে ছিল একটা দুঃসাহসিক অভিযান স্বরূপ এবং স্বকীয় পাঠন পদ্ধতির গুণে তিনি তাকে সেই আকারই দান করলেন। ছাত্রদের ভোটে তিনি বার বার সাব্যস্ত হয়েছেন সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অধ্যাপক রূপে। দেহচর্চার ব্যাপারে তাঁর এই জনপ্রিয়তা কিছুটা কার্য্যকরী হয়। কিন্তু তাঁর হস্ত—

ক্ষেপের ফলে 'ডিসিপ্লিনারী কমিটি'র আইন-কানুনের যে আমূল সংস্কার সাধিত হয় তাই ছাত্রসমাজে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে।

পূর্বে ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে তত্ত্ব-তল্লাস নেবার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষদের নিয়ে একটা পর্যবেক্ষক কমিটি গঠন করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। মিসেস্ উইলসনের হস্তক্ষেপের ফলেই সে প্রথার সংশোধন সম্ভব হয়। ডিসিপ্লিন কমিটির সদস্যদের কর্মতৎপরতা তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না। তিনি যখন ছাত্রাবাসে যেতেন, কিম্বা ছাত্ররা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতো। তিনি তখন তাদের জিজ্ঞেস করতেন, 'আচ্ছা বলতো তোমরা কোন প্রথাটা পছন্দ কর: নিজেদের আত্মসম্মানের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা অথবা সব সময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণের অধীনে থাকা?' প্রশ্নের জবাবে সমস্বরে তারা সমর্থন জানাতো আত্ম-সম্মানের উপরে নির্ভরশীলতার স্বপক্ষে। এই কারণেই প্রিন্সটনে এ প্রথার প্রচলন হয়।

উইলসন পরিবারের তিনটি শিশু কন্যার লালন-পালনের ক্ষেত্রে এই প্রথাই চিরদিন পালিত হয়ে এসেছে। নিজেদের ইচ্ছামত চিন্তা করবার এবং সহজাত সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করবার স্বাধীনতা দানই ছিল সে পরিবারের শিশু শিক্ষার মূলনীতি। প্রিন্সটনের রাজনৈতিক ধন-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন লোকের পক্ষে স্বৈরাচারী শাসন ও অভিভাবকত্বের আতিশয্য অসহনীয়। আনন্দময় সেই অতীত দিনের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে মার্গারেট উইলসন লেখেন:

জোর করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এমন একটি নীতি-শিক্ষার কথাও আমার মনে পড়ে না। পিতা-মাতার নীতিবাক্যের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা আমরা অনুশাসিত হই নি। আমাদের চরিত্র অনুশাসিত হয়েছে দৃষ্টান্তের দ্বারা, যে শান্তিময় গৃহ-পরিবেশের মধ্যে আমরা মানুষ হয়েছি তার দ্বারা।

'দি স্টেট' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর উইলসন যে নূতন পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হলেন, তার নাম 'ডিভিস্যান অ্যাণ্ড রিইউনিয়নই, (বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন)। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ও পুনর্গঠনের ইতিহাস এ বইখানিতে

আলোচিত হয়। বইখানার রচনা শেষ হয় ১৮৯৩ সালে এবং তা প্রকাশিত হয় সেই বৎসরেই। গ্রন্থকার যে যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ের একটির অন্তর্গত এবং তা হওয়ার সঙ্গে পরাজয় ও দুঃখ দুর্ভোগজনিত তিক্ততার অংশভাগী, গ্রন্থের মধ্যে তার ক্ষীণতম ইঙ্গিত পর্যন্ত কোথাও আভাসে ব্যক্ত হয় নি। তাঁর এই নির্লিপ্ত দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে দাহ্যপদার্থপূর্ণ এহেন একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের আলোচনাও এমন শান্ত ও সুস্থভাবে সম্পন্ন হয়েছে যে, উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় আমেরিকারই বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থখানি গৃহীত হয়েছে পঠনোপযোগী পাঠ্যপুস্তকরূপে। সে বছরই 'মিয়ার লিটারেচার' ও 'অ্যান ওল্ড মাষ্টার' নামে আরও দুখানি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয়। আমেরিকাকে গড়ে তোলার কাজে যাঁরা সাহায্য করেন, তাঁদেরই চরিত-কথা আলোচিত হয় এই বই দু'খানিতে। তাঁদের মধ্যে আছেন হ্যামিলটন, জেফারসন ও লিঙ্কন। জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনী প্রকাশিত হয় ১৮৯৬ সালে। 'হিষ্ট্রী অব্ দি আমেরিকান পিপল' নামক বইটি প্রকাশ লাভ করে এরই অব্যবহিত কাল পরে। বিষয়টি সম্বন্ধে নিজে জ্ঞানলাভ করার উদ্দেশ্যেই যে বইখানা লেখা হয় গ্রন্থকার এ কথা স্বীকার করেছেন।

'কনষ্টিটিউশ্যানাল গভর্ণমেণ্ট' (সাংবিধানিক সরকার) নামক পুস্তকটি তাঁর সর্বশেষ রচনা। আমেরিকান গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে তিনি যা কিছু লিখেছেন তৎসমুদায়ই তিনি এই গ্রন্থে একত্রিত করেন ও পর্যালোচনা করেন সম্পূর্ণ নূতন এক দৃষ্টিকোণ থেকে। সংবিধানের অধীন বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ও সাবলীল ভাষায় আলোচনা তো করেছেনই, তাছাড়াও, নিজের রাজনৈতিক দর্শনের বিশেষ বিশেষ তত্ত্বগুলি সম্পর্কে টীকা-টিপ্পনী ও তার সঙ্গে সংযোজিত করেছেন। সে মন্তব্যগুলি যেমন সরস, তেমনি তীক্ষ্ণ। সুনিয়ন্ত্রিত মনের যুক্তির আলোকে মন্তব্যগুলি জল-জল করছে।

যে স্বাধীনতা অপরিবর্তনীয় আইনের অনুশাসনের অধীন, আসলে সে স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়। সরকারী শাসনযন্ত্র আমাদের জীবনেরই অংশবিশেষ এবং সেই কারণে জীবনধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হতে বাধ্য—কি আদর্শ, কিআচরণ দুই দিক থেকেই। স্বায়ত্তশাসন কোন জাতির পক্ষে দান হিসেবে পাবার মত বস্তু নয়, কারণ, এটা চরিত্রেরই

চিত্র, শাসনতন্ত্রের স্বরূপ নয়। প্রেসিডেন্ট তাঁর দলের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেছেন জাতিকে তার বিধিসম্মত রাজনৈতিক লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত করবার জন্য। সরকারী শাসনতন্ত্রের কাঠামো তাঁর এই বিশিষ্ট ভূমিকা সঙ্কুচিত ও সীমিত করেছে মাত্র, পঙ্গু ও পর্যুদস্ত করে দেয় নি।

যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার মধ্যে উইলসন একদা জাতির পুরোভাগে এসে দণ্ডায়মান হন সে সব ঘটনা স্মরণে রেখে 'কনষ্টিটিউশ্যানাল গবর্ণমেণ্ট' পাঠ করলে তার ভেতর এমন অনেক অনুচ্ছেদ পাওয়া যাবে—যা ভবিষ্যদ্বাণীর মত শোনায়। তিনি লেখেন:

প্রেসিডেন্টের হাতে যে সব উচ্চ পর্যায়ের ক্ষমতা ন্যস্ত আছে তাদের মধ্যে একটির কথা আমি এখনও বলি নি। সেটি হচ্ছে, দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা। আন্তর্জাতিক নীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের অধিকারে আছে তা অসংযত ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রেসিডেন্ট অবশ্য সেনেটের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন জাতির সঙ্গে কোনরূপ চুক্তি সম্পাদন করতে পারেন না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কূটনীতির প্রতিটি পর্যায় তাঁর পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। কূটনীতি নিয়ন্ত্রণের অর্থই হল গবর্ণমেণ্টের মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চুক্তি সম্পাদনের রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। আলাপ-আলোচনা যতক্ষণ না চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ততক্ষণ পর্যন্ত আলোচনার অগ্রগতির কোন পর্যায় সম্বন্ধে কোনরূপ তথ্য প্রকাশ করতে তিনি বাধ্য নন। কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের আলোচনা যখন চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি লাভ করে, গভর্ণমেণ্ট তখন সে সিদ্ধান্ত মেনে নেবার জন্য প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তখন ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, সে সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া সেনেটের পক্ষে আর গত্যন্তর থাকে না।

১৮৯৬ সালে, যখন তাঁর জর্জ ওয়াশিংটন নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, উইলসন তখন তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্সটন কলেজ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় সেই বছরেই। এতদিন পর্যন্ত সেটি পরিচিত হয়ে এসেছে নিউ জার্সির কলেজ। পঁচিশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তার নূতন নাম করণ হয় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়। সেই মহান ঘটনা ঘোষণা করবার ভার পড়ে উইলসনের উপরে। সেই উপলক্ষ্যে তিনি যে ভাষণ দান করেন,

ইতিহাসে তা আজও অভিহিত হয়ে রয়েছে 'জাতির সেবায় প্রিন্সটন' এই আখ্যায়। সেই ভাষণে তিনি সব চেয়ে যে বিষয়টির উপর জোর দেন তা হল এই যে, জাতির সেবার জন্য মানুষ তৈরী করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিকশিত ক'রে তোলাই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। যে বাস্তব সামাজিক পরিবেশে মানুষের জন্ম তার সঙ্গে যথাযোগ্যভাবে খাপ খাইয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান ও শক্তিকে বিকশিত ক'রে তোলার প্রতি মনকে পরিচালিত করাই শিক্ষার সত্যকার উদ্দেশ্য। শিক্ষিত ব্যক্তি ভাবজগতের একজন স্বাধীন নাগরিক সত্য, কিন্তু তাই বলে কর্মজগতে তিনি অনির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন এ ব্যাপারটা আমার কাছে চিরদিন কেমন যেন বেখাপ্পা ও স্বভাব বিরুদ্ধ বলে মনে হয়েছে।

এই ভাষণের শেষের অনুচ্ছেদটি ইংরেজী গদ্য রচনার স্মরণীয় দৃষ্টান্ত সমূহের মধ্যে নিজের জন্য যায়গা করে নিয়েছে।

শিক্ষার প্রকৃত স্থান যে কোথায় আমার মনশ্চক্ষু দিয়ে তা আমি নিরীক্ষণ ক'রে নিয়েছি, সে এক স্বাধীন, উন্মুক্ত ও বিচিত্র স্থান। সেখানে যে প্রবেশ করবে, জ্ঞান যে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে ধরার এই ক্ষুদ্র মাটির সরায় এসে অবতীর্ণ হয়েছে সে সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে তার উপায় নেই। সচেতন সে হবে বটে, কিন্তু তাই বলে হতচকিত হবে না। সেখানে যে একাগ্রতা নিয়ে সে থাকবে বহির্জগতে তার সাক্ষাত বিরল। সে স্থান জ্ঞানসাধনার সিদ্ধ আচার্যগণের আবাসভূমি। সে লোকে যাঁরা বাস করেন, মনের দিক থেকে তাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ এবং জ্ঞানের দিক থেকে চির-জিজ্ঞাসু। পৃথিবীর যাবতীয় প্রাত্যহিক প্রশ্নের তাঁরা সমাধান সন্ধান করেন যে গণতন্ত্র সম্মত পন্থায় তার রূঢ় কর্কশতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় আছে। তৎসত্ত্বেও সে স্থানটি মানুষের আনা-গোনার পথের ধার হতে বহুদূরে অবস্থিত। বিজ্ঞান সেখানে বসে আছে শান্ত ও সমাহিত আশ্রম-চারিণী সন্ন্যাসিনী রূপে, বহির্বিশ্বের ঘটনাস্রোত বয়ে চলেছে কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর চেতনা নাই, সত্য তাঁর প্রার্থনার ফলে ধরাতলে নেমে এলো কিনা সে দিকেও তাঁর লক্ষ্য নাই। সাহিত্য তাঁর আশ্রম কুটীরের উন্মুক্ত দ্বারপথ দিয়ে অঙ্গনে প্রবেশ করে। প্রাচীন কালের ঋষিদের সঙ্গে লঘুপায়ে তিনি নিঃশব্দে পদচারণা করেন কক্ষ

হতে কক্ষান্তরে; সে সব কক্ষের দেয়ালগাত্রে লিখিত আছে অতীত কালের কত বিচিত্র কাহিনী, সুদূর অতীতলোকথেকে সে কক্ষে ভেসে আসে নিরতিশয় শান্ত ও সুমধুর কণ্ঠস্বর। "জন বিরল সে কল্পলোকের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ ফেনীল সাগর বক্ষে কোন ঐন্দ্রজালিকের জাদুদণ্ড স্পর্শে জেগে ওঠে সোপান সম্বলিত স্বপ্ন সৌধ। ইচ্ছে করলে সেলোকে তোমরা প্রবেশ করতে পার, যাপন করতে পার যৌবনের আনন্দময় দিনগুলি। সে কক্ষের জানালা খোলা-মাত্র চোখে পড়বে রাজপথ, সেখানে দাঁড়িয়ে কতলোক সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচোনায় রত। সে এমন এক জগত—আদর্শ যেখানে সঙ্গোপনে আশ্রয় করে অন্তরের নিভৃতনীড়, ভেসে বেড়ায় শ্বাস বায়ুরূপে বাতাসে বাতাসে। কল্প-লোক হলেও তা নির্বোধের মনগড়া স্বর্গলোক নয়। সে এমন এক লোক যেখানে অতীত দিনের উপলব্ধ সত্যের সঙ্গে চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার ঘটে এবং চলমান বিশ্বের বর্তমান সমস্যাবলী নিয়ে বিচার-বিতর্ক হয়, সে বিতর্কে বিদ্যাবত্তা থাকে, বিদ্বেষ থাকে না। সে এমন এক জগত যেখানে পার্থিব সকল মানুষের কল্যাণ কাম্য, মানুষ এবং মানবিক জীবন সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের সে বাসভূমি। সে জগত আত্ম-কেন্দ্রিক নয়। সে জগতের আলাপ-আলোচনার ভঙ্গী নির্ভুল ও নির্দোষ, বর্তমানে জ্ঞানের যতটুকু সীমা দৃষ্টিগোচর তারও বাইরের জিনিস জানবার ও দেখবার জন্য তার অতৃপ্ত কৌতূহল। সেখানকার পরিবেশে উত্তেজনার আভাস পর্যন্ত নাই, সেখানকার বাতাস বিশুদ্ধ ও জীবনপ্রদ শ্বাস-বায়ু স্বরূপ। সে লোকের প্রতিটি চক্ষু নির্মেঘনীলাকাশের মত স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে ঊর্ধ্বলোকের দিকে নিজেদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্তির প্রতিশ্রুতি লাভের প্রতীক্ষায়। কে আমাদের বলে দেবে সেলোকের পথের সন্ধান?

উইলসনের এই ভাষণের প্রতিধ্বনি শিক্ষায়তনের সীমা লঙ্ঘন ক'রে বহু দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। উইলসন-পত্নী তাঁর এক বন্ধুকে পত্রের মারফতে জানান যে, প্রিন্সটনের লোকেরা সেদিন তার স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে রীতিমত আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিল। তিনি আরও লেখেন যে, সেদিন যারা তাঁর কাছাকাছি পৌছোতে পারে নি, আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা পরস্পরের করমর্দন করে একে অপরকে অভিনন্দন জানায়। রহির্জগৎ

থেকে প্রশংসা তাঁর উদ্দেশে বর্ষিত হয় অজস্র ধারায়। শিক্ষা-জীবনের কোষের মধ্য থেকে উইলসনের সত্যকার সত্তা তখন সবে মাত্র বেরিয়ে আসছে; তাঁর যৌবনের স্বপ্ন তখন রূপায়িত হতে চলেছে বাস্তবে।

সেই বছরেরই গোড়ার দিকে কাজ কর্মে রত থাকা কালে বরাবরের মতই কর্মরত অবস্থায় তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যলাভের জন্য গ্রীষ্মকালে তিনি বাইরে চলে যান। এই তাঁর প্রথম ইউরোপ পরিদর্শন। সেখানে বৃটেনে থাকা কালে তিনি সেই সব ব্যক্তির সমাধি মন্দিরের সন্ধানে বেরোন যাঁদের বিপুল অবদান তাঁর চিত্তকে ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ করেছে। এই সব সমাধি-মন্দির পরিদর্শন তাঁর কাছে তীর্থদর্শনের সমতুল। তিনি কখনও চলেছেন অ্যাডাম স্মিথের সমাধি দেখতে কখনও বা সেই কুটীর দেখতে বার্ণস যেখানে ভূমিষ্ট হন, কখনও বা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাস ভবনে গিয়ে তুলে আনেন একটি ফুল এবং কখনও বা খুঁজে বেড়ান এডমাণ্ড বার্কের সমাধি। সেক্‌সপীয়ারের দেশ জুড়ে চলে তাঁর তন্ন তন্ন সন্ধান। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে তিনি আরও দুবার সেই আনন্দের আস্বাদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে কিছুদিনের জন্যে তিনি যখন বৃটেনে যান, তখন সহযাত্রীরূপে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর পত্নী। সে দেশ ছিল তাঁর একান্ত প্রিয়, কারণ সে দেশের বহু মনীষীর চিন্তার অবদান তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছিল।

এই তৃতীয়বার ইউরোপ পরিদর্শনের প্রাক্কালে উইলসনের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রিন্সটন কলেজের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ১৮৯৬ সালে ভাষণ প্রদত্ত হবার পর থেকে সে ভাষণ ব্যাপক ভাবে প্রচার লাভ করে। শিক্ষক হিসাবে তাঁর অসাধারণ যোগ্যতা, মানুষের জীবনে ও জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সম্পর্কে তাঁর উদার ধারণা এবং বক্তা-রূপে তাঁর প্রসিদ্ধি এ সবই তখন ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে। অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিও তখন আকৃষ্ট হতে থাকে প্রিন্সটনের এই লোকটির প্রতি এবং তাঁর কাছে আসতে থাকে কার্যকরী প্রস্তাবসমূহ। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তাঁর কাছে প্রস্তাব আসে পাঁচটী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের পদ গ্রহণের জন্য।

প্রেসিডেণ্ট প্যাটন যখন ১৯০২ সালে প্রিন্সটন কলেজ থেকে পদত্যাগের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন, ঘটনা চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করলো তখনই। এতদিন পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হয়ে এসেছেন গীর্জার

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে। এ প্রথা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও ডক্টর প্যাটম প্রস্তাব করলেন যে, উড্রো উইলসনকেই নির্বাচিত করা হোক তাঁর উত্তরাধিকার রূপে। বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠলেন এবং প্রস্তাব উত্থাপিত হবামাত্র উইলসন তা গ্রহণ করলেন।

চার

রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষাবিদের প্রবেশ

উড্রো উইলসন যখন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টপদে অভিষিক্ত হন তখন তাঁর বয়স ছেচল্লিশ বৎসর। সেবারের সেই অক্টোবর মাসে তিনি যখন তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন, অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি তখন শক্তি ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চশিখরে সমাসীন। অবশেষে উন্নতির যে উচ্চ শিখরে তিনি সমারূঢ় হয়েছেন সেখান থেকে ভবিষ্যৎ তাঁর দৃষ্টিগোচর। সেখানে উঠে তিনি দেখতে পেলেন, এক গৌরবময় ভবিষ্যৎ পথপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছে।

জীবন-পথের চলমান পথিক তাঁর বিবেক, কাজেই তার তাড়নায় যে অধীর, ঠায় দাঁড়িয়ে অতীতের সুখময় স্মৃতির রোমন্থন করবার অথবা ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর হবার তার অবকাশ কোথায়! বিবেক তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিল, এখনও অনেক কিছু তাঁর করবার আছে। অবশ্য গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি পড়া-শোনা করেছেন, লিখেছেন এবং বলেছেন অনেক। তাঁর ধারণাগুলি কতখানি বাস্তবমূল্য বহন করে—প্রিন্সটনে বসে তা পরখ করে দেখবার সময় এসেছে। এ চিন্তা তাঁকে প্রলুব্ধ করে তুললো

বটে, কিন্তু সাময়িক ভাবে তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। কলেজ যে কলেজ ছাড়া আর কিছু নয়, এই কথা ভেবে তিনি স্থির করলেন, তাঁর প্রথম কাজ হবে কেমন করে ভাবতে হয়—সে শিক্ষা ছাত্রদের দান করা। তার পরে আসবে—কি ভাবে জীবন-যাপন করতে হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষাদানের পালা।

কেউ কেউ বলতেন, চার-চারটে বছর শিক্ষালাভের পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ সময়। ইচ্ছে করলে, তিন বছরের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয় না কি? উইলসন অধীর হয়ে উঠতেন, জবাব দিতেন "একটা ওক্ গাছ তৈরী করতে সর্বশক্তিমান ভগবানেরও একশো বছর লাগে, কিন্তু একটা বর্ষণের জলেই আগাছার পক্ষে গজিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।" বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম কমিয়ে দেবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না বরং তিনি চেয়েছিলেন তাকে বর্ধিত করতে। গড়পড়তা ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে বিভ্রান্তির লেশমাত্র তাঁর মনে ছিল না। দু'জন আগন্তুকের মধ্যে যে কথোপকথন একদা শুনেছিলেন, তিনি প্রায়ই তার পুনরাবৃত্তি করতেন: একজন বললো, "ওই যে ওখানে গম্বুজওয়ালা বাড়ীটা দেখতে পাচ্ছো?" অন্যজন জবাব দেয়, "পাচ্ছি কিন্তু ও কথা জিজ্ঞেস করছো কেন?" প্রথম জন বলে, "দু'দিন আগেও লোকে জানতো, ও একটা গম্বুজওয়ালা বাড়ী মাত্র, কিন্তু আজ ওই গোটা বাড়ীখানা পরিণত হয়েছে কলেজে।" তাঁর এই কথোপকথনের পুনরাবৃত্তি জবাব হিসাবে জবরদস্ত ও কার্যকরী হোত।

ডক্‌টর উইলসনের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই স্থান—ছাত্রেরা যেখানে তাদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তুলবে এবং তা তুলবে-সেই জ্ঞানের দ্বারা তাকে সমৃদ্ধ করে, উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যাকরণে ও পাঠ্যক্রমের মধ্যে যা লভ্য নয়। ছাত্রসমাজ কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একমত ছিল না, তাদের মধ্যে অনেকের কাছেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটা আনন্দনিকেতন ক্লাব ঘর বিশেষ; সেখানে প্রতিনিয়ত প্রয়োগের সাহায্যে সংসারী জীবের উপযোগী দক্ষতা অর্জন করা যায় মাত্র, জ্ঞানার্জন কোনক্রমেই নয়।

এই মনোভাবের পরিবর্তন সাধন করার অর্থ হল, সেই শিক্ষা ও জীবন-যাপন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা—যাকে আশ্রয় করে বেশীর ভাগ অধ্যাপক এবং ছাত্রই পরম পরিতুষ্ট জীবন-যাপন করছে। নূতন প্রেসিডেন্ট

তবু সেই পরিবর্তন সাধনের জন্যই প্রয়াসী হলেন। তার ফলে কলেজের মধ্যে দেখা দিল অভূতপূর্ব কর্মচাঞ্চল্য, প্রথম প্রবেশার্থীদের অত্যন্ত কড়াকড়ি ও কঠোরতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। চারিদিক থেকে জেগে উঠলো অসন্তোষের তীব্র প্রতিবাদ। শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক এই সব কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার বোঝা ঘাড়ে বহন করতেই হবে—এ কী অমানুষিক অত্যাচার! ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে এই সংগ্রাম শেষ হবার আগেই অপেক্ষাকৃত দুর্বলচিত্ত যারা তারা আস্তে আস্তে সরে পড়লো, ফলে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেলো বটে, কিন্তু অধ্যাপকের সংখ্যা গেল বেড়ে।

যা বাস্তব ঘটনা—ছাত্রদের তা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য করার মধ্যেই আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত উইলসনের ধারণা চরম পরিসমাপ্তি লাভ করলো না। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে সেই সনাতন ব্যবধান অবশ্য রয়েই গেলো, তার ফলে, যে সব অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্‌গণের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ছাত্রদের মধ্যে যা কিছু সৎ ও মহৎ তাকে বিকশিত করে তুলতে পারতো তা হতে তারা বঞ্চিত হতে থাকলো। এই আদর্শ উপলব্ধির উদ্দেশ্যে উপদেশাত্মক শিক্ষাদানপদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন। প্রত্যেকটি ছাত্র যাতে করে আত্মবিকাশের সুযোগ পায় তার জন্য শ্রেণীগুলির আকার দেওয়া হল কমিয়ে। অধ্যাপকগণ যাতে করে ছেলেদের সঙ্গে একই ছাত্রাবাসে থেকে তাদের কাজ-কর্ম পরিচালনের পক্ষে সাহায্য করতে পারেন, তাদের সঙ্গে গড়ে তুলতে পারেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের নিবিড় বন্ধন—সে ব্যবস্থাও অবলম্বিত হল সঙ্গে সঙ্গে।

শিক্ষাদানের এ এক অভিনব পদ্ধতি, কাজেই রক্ষণশীলদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হল। কিন্তু উইলসনের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার গাত্রে আহত হয়ে সে বিরোধিতা বিপর্যস্ত না হয়ে পারলো না। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে আসতেন, তিনিই প্রভাবিত হতেন তাঁর ঐকান্তিকতা, দৃঢ় চিত্ততা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের দ্বারা। বিত্তশালী ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানালে, তাঁরা সে আবেদনে সাড়া দিতেন তৎপরতার সঙ্গে। যে স্বপ্ন দীর্ঘদিন ধরে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে জেগে রয়েছে, তরুণ অধ্যাপকদের এবং কিছু সংখ্যক ছাত্রের মনেও তার ছোঁয়া লাগলো এবং

লাগবামাত্র যৌবন-সুলভ হৃদয়াবেগের বশে—তারা তৎক্ষণাৎ সর্তহীন সমর্থন জানালো তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার স্বপক্ষে।

তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে উইলসন এমন এক গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি রচনার কার্যে আত্মনিয়োগ করলেন—যা অনুসৃত হলে প্রিন্সটনের সমাজ-জীবনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে। লোকে তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির নাম দিল 'কোয়াড্রাংগল কোয়ার্ল'। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী চতুষ্কোণ আকারের জায়গার চারিপাশ ঘিরে এমন সব নূতন নূতন ছাত্রবাস গড়ে তুলতে হবে—যেখানে ছাত্র ও অধ্যাপকগণ একত্র বাস করতে পারবেন, একসঙ্গে আহারাদি করতে পারবেন এবং উচ্চ ও নিম্ন সকল শ্রেণীর ছাত্ররা পরস্পরের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে পারবে; তার ফলে তাঁর পরিকল্পনা পরিপূর্তি লাভ করবে যথাসম্ভব।

এর আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-জীবন গড়ে উঠেছিল এমন কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্লাবের সমষ্টিরূপে—যেখানে শ্রেণীগত পার্থক্য মেনে চলা হোত এবং শরীর চর্চার তুলনায় জ্ঞানানুশীলনের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শনই ছিল যেখানকার প্রচলিত রীতি। এখন 'কোয়ার্ড' প্রথা যদি প্রচলিত হয়, তা'হলে বিচ্ছিন্ন সমিতিগুলি বিলুপ্ত হতে বাধ্য। শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে উইলসন যে ধারণা পোষণ করেন, ধন-সম্পদ, খেলা-ধূলা ও আমোদ-প্রমোদের উপর গুরুত্ব আরোপের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই। "পল্লী সমিতির সভাপতি আমি হতে চাই না."—এ সম্পর্কে এই ছিল তাঁর সাফ জবাব।

প্রস্তাবিত সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে বাদানুবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ রইল না। দেশের বিভিন্ন অংশে যে সব ছাত্র ছড়িয়ে রয়েছে তারাও এ নিয়ে বিচার-বিতর্ক করতে লাগলো এবং তাদের দৃষ্টিতে এটা প্রতিভাত হল তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের অপহরণ রূপে। একজন তো পরিষ্কার বলেই বসলো 'ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন ভদ্রলোককে ইতরের সঙ্গে একত্র আহারে বাধ্য করা হচ্ছে।' এই বিরোধিতা উইলসনের মনে সংগ্রামী মনোভাব জাগিয়ে তুলল এবং তাকে উৎসাহিত করল জনসাধারণের সম্মুখে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে। গণ-সমর্থন তাঁকে এই বলে সম্বর্দ্ধনা জানালো যে, এই একজন লোক যিনি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে উদ্যত হয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাষ্টীরা গোড়ার দিকে উইলসনকে সমর্থনই করেন, কিন্তু শেষ কালে তাঁরা বেঁকে দাঁড়ালেন। কিছুকালের জন্য অধিকতর জরুরী একটা সমস্যার চাপে 'কোয়ার্ড প্রথা' চাপা পড়ে গেলো।

প্রিন্সটনে একটা গ্রাজুয়েট স্কুলের অভাব বহুদিন হতে অনুভূত হয়ে আসছিল। সে সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা রচিত ও গৃহীত হল এবং তার রূপায়ণের দায়িত্ব অর্পণ করা হল ডীন ওয়েষ্টের উপরে। স্থির হল, গ্রাজুয়েট স্কুলকে আর্থিক আনুকূল্যের জন্য নির্ভর করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকে সংগৃহীত চাঁদার উপরে। প্রতিপক্ষ এই সিদ্ধান্তকে লুফে নিলেন উইলসন পরিকল্পিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার হাতিয়ার রূপে।

জনৈক বিত্তশালী প্রাক্তন ছাত্র প্রস্তাবিত গ্রাজুয়েটস্কুলের বাড়ী তৈরীর জন্য পাঁচলক্ষ ডলার দিতে চাইলেন এই সর্তে যে, সে অর্থের সদ্ব্যবহারের ভার থাকবে ডীন ওয়েষ্টের হাতে এবং বিদ্যালয়ের সংগঠন ও পরিচালনের সমূহ দায়িত্ব অর্পিত থাকবে তাঁর উপরে। উইলসন দেখলেন, এ সর্তে সম্মত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশবিশেষের নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রেসিডেণ্টের হাতের বাইরে চলে যাবে এবং তার ফলে, বিদ্যালয় গড়ে উঠবে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান রূপে; কেবল তাই নয়, অর্থের দাবীর উপর দাঁড়িয়ে সর্ত আরোপ করতেও হয় তো সে কুণ্ঠিত হবে না। এই কথা ভেবে চাঁদা সংক্রান্ত প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেন এবং তার ফলে প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।

এতবড় একটা বিরাট অঙ্কের চাঁদা প্রত্যাখ্যান করা বোর্ড অব্ ট্রাষ্টীর পছন্দসই হল না। আদর্শ অবশ্য ভাল কথা, কিন্তু বিদ্যালয় গড়বার জন্য চাই অর্থ। একদিকে ভাব-সর্বস্ব আদর্শবাদিতা এবং অন্যদিকে অর্থ-সমৃদ্ধ তহবিল—এই দুইটি বস্তুকে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে শেষোক্ত বস্তুটিই যে সান্ত্বনা-দায়ক হবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে বিতর্ক দিনে দিনে বেড়েই চললো।

প্রিন্সটন হয়ে দাঁড়ালো সে বিতর্কের উন্মুক্ত ও উদার মঞ্চ। সে মঞ্চের একদিকে দাঁড়িয়ে আছেন প্রেসিডেণ্ট উইলসন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক প্রবর্তন সংক্রান্ত স্বকীয় পরিকল্পনার উপর অটুট আস্থা নিয়ে আর তাঁর পক্ষে

আছেন জনকয়েক তরুণ অধ্যাপক। বলা বাহুল্য, তরুণ-সমাজের কাছে তাঁর আবেদন অনস্বীকার্য। তাঁর বিপক্ষে আছেন অর্থবলে বলীয়ান ক্লাবগুলি এবং বিদ্যার্থীদের একটা প্রভাবশালী অংশ। সে বিরোধে অর্থই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হল।

১৯১০ সালের মে মাসের এক সকালে জনৈক সাংবাদিক উইলসনের পড়ার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সামনে উপবিষ্ট ব্যক্তিটী শিক্ষা সম্বন্ধে যে আদর্শ পোষণ করেন, তা ধূলিসাৎ করবার মত তথ্যে সজ্জিত হয়েই তিনি এসেছিলেন। ম্যাসাচুসেট্‌সের আইজাক ওয়াইম্যান নামক (সম্প্রতি মৃত) জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি শিক্ষাখাতে ত্রিশলক্ষ ডলার দান করেছেন ; তবে সে অর্থ তিনি প্রিন্সটনকে দেন নি, দিয়েছেন ডীন ওয়েষ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত গ্রাজুয়েট স্কুলকে। সাংবাদিক ভেবেছিলেন, এই তথ্য প্রকাশের ফলে একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। কিন্তু তাঁকে হতাশ হতে হ'ল। ডেস্কের সম্মুখে উপবিষ্ট লোকটি কোনরূপ মন্তব্য না করেই সংবাদটি গ্রহণ করলেন।

সাংবাদিক চলে গেলে, স্বামীর উচ্চ হাস্যের শব্দ এলেন উইলসনের কাণে গেল ; তিনি জানতেন, স্বামী ঘরে একা আছেন, অথচ তা সত্ত্বেও আপন মনে তিনি হেসে চলেছেন তাতে সহজাত স্ফূর্তির একান্ত অভাব। ঘটনাটা স্ত্রীর কাছে আনুপূর্বিক বিবৃত করে তিনি বললেন, "জ্যান্তমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করা চলে, কিন্তু মৃতের সঙ্গে বিরোধ সম্ভব নয়। যা হবার তা হয়ে গেছে।"

নেতৃত্ব তাঁর হাত-ছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য কোন দুঃখ ছিল না। তাঁর দুঃখ এই যে, যে-আদর্শের উপর তাঁর আস্থা এবং তাঁর সংগ্রাম যে আদর্শের জন্য, তা পরাজিত হল। যে গণতান্ত্রিক আদর্শকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে চান, তিনি বুঝতে পারলেন যে, প্রিন্সটন তার রূপায়ণের পক্ষে আর যোগ্য ক্ষেত্র নয়। তাঁর মনে হল, শিক্ষাক্ষেত্রই যে তাঁর একমাত্র কর্মক্ষেত্র এমন নাও হতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানার বাইরে জীবন-সমুদ্রের যে উত্তালতরঙ্গ ভঙ্গ চলছে, গত বিশ বৎসর ধরে তার গর্জন তাঁর কাণে এসে পৌঁচেছে অতি ক্ষীণ গুঞ্জন ধ্বনি হয়ে। কর্মব্যস্ত জীবনের উচ্চ কোলাহল তিনি এতদিনে শুনতে পেলেন। সে শব্দ তাঁকে অধীর ও অসহিষ্ণু করে তুললো। কর্মণীয়

কত কাজই না এখনও তাঁর করতে বাকী! প্রিন্সটনের বিপর্যয় সংঘটিত হবার বছর কয়েক আগে ১৯০৬ সালের শীতকালে নিউইয়র্কের 'লোটাস ক্লাবে' অনুষ্ঠিত এক ভোজসভায় তিনি যোগদান করেছিলেন। সেখানে তিনি একটা বক্তৃতা দেন। রাজনৈতিক সমস্যাবলী ও মূলনীতি ছিল তাঁর ভাষণের বক্তব্য বিষয়। বক্তৃতা শেষ করে তিনি যখন আসন গ্রহণ করলেন, 'হার্পারাস উইকলী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক কর্ণেল হার্ভে সভাস্থলেই ঘোষণা করলেন যে, ১৯০৮ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য যে প্রতিযোগিতা হবে, তাতে উইলসনকে ডেমোক্রাটিক দলীয় প্রার্থীরূপে মনোনয়ন দানের তিনি পক্ষপাতী।

'জাতীর সেবায় প্রিন্সটন' সেদিন ছিল তাঁর ভাষণের বক্তব্য বিষয় এবং স্মরণীয় সেই ভাষণকে উপলক্ষ্য করেই উভয় ব্যক্তির মধ্যে প্রথম দেখা-সাক্ষাত। উইলসনের আদর্শ হার্ভের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। তিনি দেখতে পেলেন, ভাবী প্রেসিডেন্টের অশুভ সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে উইলসনের মধ্যে। ডেমোক্রাটিক দলের ওপর ব্রায়াঁর প্রভাব কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রচণ্ড, কাজেই ১৯০৮ সালের নির্বাচনে তিনিই ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন লাভ করলেন। সে প্রতিযোগিতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন হাওয়ার্ড টাফ্ট।

তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টেনে নামানোর জন্য হার্ভের এই প্রচেষ্টায় উইলসন বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন না এবং হার্ভের এই প্রস্তাবের ফলে তাঁর ভাষণের ধারা ধরণের সুর বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হল না, দলের কর্তাদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে নেবার জন্য তাঁর অভিমত সংশোধিত হল না এতটুকুও, বিশ্ববিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিক আদর্শে গড়ে তোলবার জন্য তাঁর এই সংগ্রাম তাঁকে দেশব্যাপী পরিচিতি দান করে বটে, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে কোন রাজনৈতিক সম্ভাবনা নিহত থাকতে পারে এ কথা কেউ মেনেনিতে চাইলো না। ক্লীভল্যাণ্ডের পরে ডেমোক্রাটিক দলের অন্য কোন প্রার্থীর পক্ষেই হোয়াইটহাউসে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় নি।

হার্ভে বিশ্বাস করতেন যে, রাজনৈতিক মতবাদ নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মত কূল থেকে ভেসে চলেছে। ক্লীভল্যাণ্ড-যুগ দেশকে দান করে গেছে

রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তার উত্তরাধিকার। থিওডোর রুজভেল্ট তখন তাঁর 'নবজাতীয়তাবাদ' তত্ত্ব প্রচারের কার্যে ব্যাপৃত আছেন এবং সে প্রচার কার্য জন-চিত্তে যে আদৌ কোন সাড়া জাগাচ্ছে না তা নয়। বাতাসে আসন্ন পরিবর্তনের একটা আভাস অবশ্য ভেসে উঠেছে, কিন্তু হার্ভের প্রশ্ন হল এই যে, চলমান ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে যথাযোগ্য ভাবে বাঙ্ময় করে তোলার পক্ষে উইলসনের তুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি আর কে আছেন?

হার্পার্স উইকলীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী সম্পাদক কৃতসঙ্কল্প হয়ে কাজে নেমে পড়লেন, প্রেসিডেণ্ট তৈরীর ভার যাঁর হাতে, অপচয় করবার মত যথেষ্ট সময় তাঁর কোথায়! নিউ জার্সীর ডেমোক্রাটিক দলীয় কর্তা জেম্‌স স্মিথের সঙ্গে তিনি সাক্ষাত করলেন এবং জানতে চাইলেন, গভর্ণরের পদের জন্য তিনি উইলসনকে সমর্থন করবেন কি না? কি সর্তে?—স্মিথ পাল্‌টা প্রশ্ন করলেন। হার্ভে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন। তাঁর প্রার্থী রাজনীতির বাজারে বিক্রয় যোগ্য পণ্যবস্তু নয় যে, তাঁকে নিয়ে দর-দস্তরী করা চলবে।

হার্ভে উইলসনের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। তিনি জানতে চাইলেন, আগামী নির্বাচনে গভর্ণরপদের জন্য প্রার্থী দাঁড়াতে উইলসন রাজি আছেন কি না? উইলসন বললেন, তিনি ইচ্ছুক। কিন্তু ভাব-ভঙ্গী থেকে মনে হল আপাততঃ ঘটনাস্রোতের গতি ও প্রকৃতি নিরীক্ষণ করার তিনি পক্ষপাতী। স্থির হল, স্মিথ এবং হার্ভের সঙ্গে সাক্ষাত করে তিনি একবার আলাপ-আলোচনা করে নেবেন। সময় সমুপস্থিত হলে দেখা গেল, তিনি নির্বিকার চিত্তে গীর্জার পথে পা বাড়িয়েছেন। হার্ভে সেই মুহূর্তে ছুটলেন তাঁর পিছু পিছু এবং সগর্বে আবার ফিরিয়ে আনলেন তাঁর মনোনীত প্রার্থীকে। জানতে চাইলেন, মনোনয়ন তিনি নেবেন কি না? উইলসন সম্মতি জানালেন, কিন্তু এই সর্তে যে, অগ্রিম কোন প্রতিশ্রুতি তাঁর কাছ থেকে আদায় করে নেবার চেষ্টা হবে না।

স্মিথের রাজনৈতিক জীবনে এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। কিন্তু তা হোক গে, তাতে কিছু আসে যায় না। স্মিথ যে প্রদর্শনীর আয়োজন করতে চলেছেন, দর্শনীয়বস্তুরূপে জানালার উপর স্থাপিত হয়ে উইলসন তার শোভা বর্দ্ধন করবেন মাত্র। এই কলেজ-প্রেসিডেণ্টকে নিয়ে যে কোন রকম অসুবিধায়

তাঁকে পড়তে হতে পারে এমন কোন আকাঙ্ক্ষাই তাঁর মনে ছায়াপাত করল না। নিজের ছবির মত সুন্দর বাড়ী, তাঁর অধ্যাপনা-জীবন, গ্রন্থ সমৃদ্ধ তাঁর পাঠাগার, তাঁর মনোরম কুসুম কুঞ্জ এ সব ছেড়ে তিনি যদি সেই নগ্ন কদর্যতার আগারে আসতে রাজি হন—যেখানে অগণিত জনগণ রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনের নামে জামার হাত গুটিয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে উচ্চ চিৎকারে স্থানটিকে তাতিয়ে ও মাতিয়ে তোলে, সেটা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব চিন্তার বিষয়।

১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে উইলসন গভর্ণর পদের প্রার্থীরূপে ডেমোক্রাটিক দলের মনোনয়ন লাভ করলেন। শিক্ষাবিদ ও সংস্কারকের দৃষ্টি দিয়ে প্রতিটি ইঞ্চি পরিমিত স্থান তিনি পরীক্ষা করে নিলেন এবং তার পর প্রবৃত্ত হলেন আনুষ্ঠানিক পর্ব সম্পন্ন করবার কাজে। কোলাহলরত প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, "আমি এই মনোনয়ন লাভের জন্য মোটেই চেষ্টা করি নি, আবদ্ধ হই নি কোন শপথ অথবা প্রতিশ্রুতিতে। কথা দিচ্ছি, আমি যদি নির্বাচিত হই এবং হব বলেই আমার বিশ্বাস, তা'হলে ঐকান্তিকতার সঙ্গে আমি আপনাদের সেবা করবো। এ সব কথা আমি বলতে পারছি এক নূতন যুগের দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে।"

দলপতি স্মিথ কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। প্রচার কার্য পরিচালনে তাঁর প্রার্থীর দক্ষতা দেখে পরে বরঞ্চ তিনি বিস্ময়ই বোধ করেছিলেন। অক্টোবর মাসে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করে প্রচার-পয়োধিজলে তিনি পূর্ণবেগে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর বাগ্মীতা ও আদর্শ-নিষ্ঠার খ্যাতি নিউ জার্সির সীমানা অতিক্রম করে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় উনপঞ্চাশ হাজার ভোটাধিক্যে তিনি নির্বাচিত হলেন নভেম্বর মাসে।

তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "যে লোক আজও ত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে নি তার স্বল্পপরিসর জীবন-কালের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলে গেছে। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে বলেই পরিবর্তন এসেছে সমাজ-জীবন ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে।" তিনি দাঁড়ালেন সেই নবযুগেরই মুখপাত্র রূপে। গতানুগতিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসান তাঁর কাজ নয়। যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা রাজনীতিক্ষেত্রে

উৎসারিত হ'তে চলেছে, তিনি চান তাঁর শাসনকালকে সেই নূতন তত্ত্বেরই ব্যাখ্যাতা করতে।

প্রাক্তন কলেজ-প্রেসিডেণ্ট এক প্রাণবান ও বেগবান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। নেতা হবার জন্য যে সব যোগ্যতা প্রয়োজন, ক্রমে সেগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। দলের নেতা স্মিথের এতদিনে হুঁস হল যে, লোকটিকে বুঝতে তাঁর ভুল হয়েছে। স্মিথ এবং উইলসনের মধ্যে যদিও বোঝা-পড়া ছিল যে, স্মিথ প্রার্থী দাঁড়াবেন না, তবু সিনেটের সদস্য প্রার্থী হবার সঙ্কল্প তিনি ঘোষণা করলেন। উইলসন আপত্তি জানানো সত্ত্বেও স্মিথ প্রতিনিবৃত্ত হলেন না। গভর্ণর তখন অগত্যা ব্যাপারটি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন। গণভোটে স্মিথ পরাজিত হলে তুমুল হট্টগোল উঠলো আহত ও বিক্ষুব্ধ রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে। তাঁরা সমস্বরে আওয়াজ তুললেন 'অকৃতজ্ঞ'। এ দিকে নিউ জার্সীর অধিবাসীদের মনে তখন শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক নূতন স্বার্থ বোধ জেগে উঠেছে।

নির্বাচনের বিপণীতে যিনি ছিলেন দোকানের জানালার উপরে স্থাপিত প্রদর্শনীর পুতুল মাত্র, কর্মস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়তে তাঁর বিন্দুমাত্র বিলম্ব হল না। তত্ত্ব নিয়ে বৃথা তর্কে কালক্ষেপ করবার মত লোক তিনি নন। রাষ্ট্র পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে যে সব দুর্নীতি বিদ্যমান, তৎসমুদয় সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করলেন এক ব্যাপক পরিকল্পনা। যতক্ষণ না তাঁর ধারণা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে, ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই। উইলসন রচিত পরিকল্পনায় পুতুল-প্রতিম গভর্ণরের কোন স্থান নেই। তাঁর মতে, গভর্ণর যে কেবল দলেরই নেতা তা নন, তিনি রাজ্যেরও নায়ক। তিনি চুপ্ চাপ্ ডেস্কের সামনে বসে থাকবেন আর সমস্যাগুলি তাঁর সামনে উপস্থাপিত হবে এই প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে তিনি রাজি নন।

তা না করে, তিনি নিজে বিধানসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং যে সংস্কার তিনি সাধন করতে চান তা উপস্থাপিত করলেন সভার সম্মুখে। তাঁর পরিকল্পনার বেশীর ভাগই কার্যে পরিণত হল তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই। কৃতিত্বের এ এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। 'ডাইরেক্ট প্রাইমারী ল', 'কোরাপ্ট প্র্যাকটিসেস্ অ্যাক্ট অর্থাৎ, দুর্নীতি নিরোধ আইন', 'অ্যান এমপ্লয়িজ লায়াবেলেটিজ অ্যাক্ট বা মালিকদের দায়িত্ব নির্দেশক

আইন' এবং 'পাবলিক ইউটিলিটিজ কমিশন' প্রভৃতি বিধান তাঁর প্রবর্তিত সংস্কার সমূহের অন্যতম। তারপর এলো সেই বিধান-সপ্তক জনসাধারণের মধ্যে যা 'সাত বোন' নামে পরিচিত। এই আইন প্রণীত হয় জনসাধারণকে ট্রাষ্ট সমূহের শোষণ হতে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে। গভর্ণর উইলসন তাঁর কাজ-কর্ম নিয়ে যে রকম ঝড়ের বেগে ছুটে চললেন, নিউ জার্সীর অধিবাসীরা যদি তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কোন হেতু নেই।

কর্ণেল হার্ভে যতই এই কর্মতৎপরতা দেখেন, ততই তাঁর মনে প্রতীতি জন্মায় যে, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরূপে তিনি আদর্শ লোককেই খুঁজে বের করেছেন। দলীয় নেতা স্মিথের মনে যে শিক্ষা অস্পষ্ট ভাবে নিহিত ছিল, হার্ভে কিন্তু সে শিক্ষা গ্রহণ করলেন না। তিনি এ কথা কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না যে, কারও পরিচালনা মেনে নেবার লোক উইলসন নন, তিনি নূতন গণতন্ত্রবাদের প্রতিনিধি এইটেই তাঁর কাছে প্রথম এবং শেষ কথা।

শেষপর্যন্ত অনিবার্য বিচ্ছেদ ঘটে গেলো ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে। হার্ভে যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি যদি ওয়াল ষ্ট্রীটের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন, তাহলে উইলসনের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন, তখন তাঁর ক্ষোভের ও বিস্ময়ের অবধি রইল না। অগত্যা হার্ভের সমর্থন প্রত্যাহৃত হল। উইলসনের একদা সাক্ষাত ঘটে টেক্‌সাসের জনৈক শুক্লকেশ ও স্বল্পভাষী ব্যক্তির সঙ্গে। তাঁর মনে না ছিল কোনরূপ রাজ-নৈতিক উচ্চাভিলাষের তাড়না, না ছিল কোন প্রার্থীকে নিজের কাজে ব্যবহার করবার বাসনা। নিউ জার্সীর গভর্ণরের নীতি ও আদর্শের উপর তাঁর আস্থা এমন গভীর যে, তিনি তাঁকে শাসনক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। কারণ সে আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁর প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারণাসমূহ নিজেদের অভিব্যক্ত করবার জন্য বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাবে।

তাঁর এই নূতন বন্ধু কর্ণেল হাউস অবিলম্বে ব্যাপৃত হলেন তাঁর বিরাট পরিকল্পনাকে রূপদানের কার্যে। তার ফলে ১৯১২ সালে ডেমোক্র্যাটিক কনভেনশ্যান যখন বাল্‌টিমোরে সম্মিলিত হল, তখন ৪৬তম ব্যালটের বলে

২রা জুলাই তারিখে উড্রো উইলসন্ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদের জন্য মনোনয়ন লাভ করলেন। এ কাজ সম্ভব হল যে সংগঠনের সাহায্যে তার সদস্যরা সকলেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি। রাজনৈতিক যে মতবাদ তাঁরা বহন করেন তাতে অবিচল আস্থা আছে সকলেরই। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, বাস্তব রাজনীতি সম্বন্ধে স্বল্পমাত্র জ্ঞানও তাঁদের কারও ছিল না, কাজেই যে প্রচার যন্ত্র অগ্রগামী প্রার্থী চ্যাম্প ক্লাকের পক্ষে কার্যরত ছিল তার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার পক্ষে তা সম্পূর্ণ অযোগ্য।

পাঁচ

প্রেসিডেণ্টের পদে

প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য উইলসনের পক্ষে প্রচারকার্য চালাবার ভার যাদের হাতে ন্যস্ত ছিল তাঁদের উৎসাহের কোন অভাব ছিল না বটে, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব ছিল এতো অধিক যে, তাকে হাস্যকর বললেও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হবে না। পশ্চিম অঞ্চলে উইলসনের আদৌ কোন পরিচিতিই ছিল না, কাজেই তাঁরা উইল্‌সনের নাম ও গুণগ্রাম প্রচার সুরু করলেন সেই অঞ্চলেই। তাঁদের বিশ্বাসের জাদুদণ্ড স্পর্শে নির্বাচনীসংগ্রাম রূপান্তরিত হল ধর্মযুদ্ধে। ওয়াল্‌টার হাইন্‌স পেজ এই ধর্মযোদ্ধ দলের অন্যতম সৈনিক। নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতীক-স্বরূপ পতাকা তিনি বিচিত্র কৌশলের সঙ্গে বহন করে চললেন। তাঁর মতে, মিসিসিপির পশ্চিম পারের লোকেদের চোখে উইলসন যেন প্রখর প্রতিভাসম্পন্ন এক নক্ষত্র কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে ছুটে বেড়াচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রুজভেল্ট যুগ থেকে ভোটদাতারা এমন প্রার্থীই পছন্দ করে আসছেন যাঁর রাজনৈতিক বিজ্ঞতা না থাকলেও ব্যক্তিত্বের বর্ণবৈভব আছে। এরূপ ক্ষেত্রে দুর্ধর্ষ এই ধর্মযোদ্ধাদের কাজ হবে, মানুষ হিসাবে উইলসনের মানবিক দিকটা আমেরিকার জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরা।

বাল্টীমোর কন্‌ভেনসনে যে সব প্রতিনিধি সম্মিলিত হন তাঁদের অধিকাংশই প্রাচীন রাজনীতিপন্থী চ্যাম্প ক্লার্ককে সমর্থন করবার জন্য পূর্ব হতে প্রতিশ্রুত। তা ছাড়াও, এক বলিষ্ঠ প্রচার-যন্ত্র আছে তাঁর পক্ষে। আর অন্যতম প্রার্থী ব্রায়াঁ বরাবর দাঁড়িয়ে আসছেন বলে লোকে তাঁর নাম দিয়েছে নিত্যকালের প্রার্থী। এবারের মনোনয়ন লাভের আশা যদিও তাঁর ছিল না বললেই হয়, তবু তিনি চিরদিনের অভ্যাস বশে যথারীতি আশা করেছিলেন যে, তাঁর অনুগামীর সংখ্যা অনেক। ভোটারদের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তিনি একরকম নিষ্ক্রিয়ই রয়ে গেলেন। উইলসনের রাজনৈতিক জীবন সংক্ষিপ্ত হলেও সেই সময়ের মধ্যেই দলীয় নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, উইল্‌সন কারও কাছে বশ্যতা স্বীকার করবার লোক নন। তিনি নিজেই নিজের পরামর্শ দাতা। যে আদর্শে তিনি বিশ্বাসী তাঁর সংগ্রাম শুধু তারই জন্য এবং প্রেসিডেন্টের পদে যিনি সমাসীন হবেন তাঁর ও দলীয় নেতাদের মধ্যে বোঝাপড়ার চিরন্তন যে প্রথা আছে—উইলসনের কাছে তার বাধ্যবাধকতা স্বীকৃত নয়। নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রতি যাঁরা আকর্ষণ পোষণ করেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারলো না। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মোট তিনজন প্রার্থী। এরূপ ক্ষেত্রে রিপাবলিকান দলের যে উদারনৈতিক অংশ নবজাগ্রত রুজভেল্ট পন্থীর সঙ্গে যুক্ত হতে অনিচ্ছুক, উইলসনের পক্ষে তাঁদের অনেকের সমর্থন যে লভ্য হতে পারে এরূপ একটা সম্ভাবনা যে একেবারে নেই এমন কথা বলা যায় না।

অবস্থা অবশ্য সমস্যাসঙ্কুল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ক্লার্কের পক্ষে বলবার অনেক কিছু ছিল। বাগ্মী ব্রায়াঁ—তাঁর মধুক্ষরা রসনাকে কি সংযত রাখবেন! এদিকে হট্টগোল ও হৈহুল্লোড় চলতেই থাকে। কারণ, ডেমোক্রাটিক দলীয় সদস্যদের কি নূতন, কি পুরাতন কোন পক্ষই সংগ্রাম ক্ষান্ত করতে সম্মত নন। যখন দেখা গেল, জনমত দলীয় প্রচার-যন্ত্রের দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে, ব্রায়াঁ তখন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালেন উইলসনের পক্ষে। ইলিনয়ের প্রতিনিধিগণ নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রগতিশীল প্রার্থীর পক্ষেই তাঁদের সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। উইলসনের মনোনয়ন লাভ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

প্রতিনিধি দলের নেতাকে এ রকম মতি পরিবর্তনের হেতু জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, "ছেলের নির্দেশক্রমে আমাকে এ কাজ করতে হয়েছে।"

"কিন্তু ছেলের ইচ্ছের উপরেই বা এতখানি গুরুত্ব দেওয়া হল কেন?"

তিনি শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন, "তা যদি বললেন তা হলে আমি বলি, আমেরিকার যুবসমাজ এ সম্পর্কে যে ভাবে-চিন্তা করছে, তার প্রতিফলন পড়েছে আমার ছেলের মনের উপর। এরই নাম আদর্শবাদ। আমার সাধ্য কি তার পথরোধ করি।"

জ্ঞানের সাধনায় উইলসন যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার শান্ত ও সমাহিত দিনগুলি তাঁর বর্তমান জীবনের ক্ষেত্র হতে বিদায় নিল। তিনি যখন নিউ জার্সীর গভর্ণরের পদে নিযুক্ত, নিত্য নূতন নূতন সমস্যা এসে তাঁর অবসর জীবনের উপর হানা দিতে লাগলো। গণস্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন সমূহ সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, নূতন নূতন রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর সহনশীলতা সর্বজনবিদিত ঘটনা। এ সম্পর্কে তাই যে সব চিঠিপত্র আসতে থাকে তাঁর কাছে, তার স্তূপ জমে উঠতে লাগলো পর্বত প্রমাণ হয়ে। কেউ একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, বিপুল সংখ্যক এই সব চিঠি পত্রের জবাব দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় কেমন করে? উত্তরে সহাস্যে তিনি বললেন, "সেই আইরিশ ম্যানের গল্প শুনেছেন—যিনি কাঁটার সাহায্যে 'স্যুপ' খেতেন? একজন একটা চামচ দিতে গেলে, হাত দিয়ে সেটাকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, ঠিক আছে, কোন দরকার নেই। এতে আমার লাভই হচ্ছে।"

উড্রো উইলসন যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, তখন তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন বৎসর। একজন ডেমোক্রাটদলীয় সদস্য সে উচ্চাসনে সমাসীন হলেন বিশ বৎসর পরে। ভোটে তিনি জয়লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের উভয় পরিষদের উপরেই দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি তাঁর নূতন দায়িত্ব ভার হাতে তুলে নিলেন বটে, কিন্তু বিজয়োল্লাসের বশবর্তী হয়ে নয়। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, "আজ বিজয়োৎসবের দিন নয়, আজকের দিন আত্মোৎসর্গের।" বিধি ও বিধানের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক যে দীর্ঘ পরিকল্পনা তিনি প্রণয়ন করে রেখেছিলেন, তাঁর ইচ্ছে ছিল, নিজের কার্যকালের মধ্যেই তিনি তাকে রূপায়িত করবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে তিনি

কোন দিনই সুস্থ ও সবল মানুষ ছিলেন না। তার উপরে আবার লোকে বলাবলি করতো, তিনি নাকি হোয়াইটহাউসে এসেছিলেন মাথাধরার ওষুধ এবং ষ্টম্যাক পাম্প সঙ্গে নিয়ে। এই দিক থেকে বিচার করলে, তিনি যে কার্যসূচী গ্রহণ করলেন তা নিঃসন্দেহে নিরতিশয় শ্রম সাধ্য। মোটের উপর, তাঁর পূর্ববর্তী বলিষ্ঠদেহী প্রেসিডেণ্টের তুলনায় তিনি হাস্যকর বৈপরীত্যই বহন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেলে বিদায়ী প্রেসিডেণ্ট উইলিয়াম হাওয়ার্ড ট্যাফ্‌ট উইলসন দম্পতিকে হোয়াইটহাউসে স্বাগত সম্বর্ধনা জানালেন এবং জানাতে গিয়ে বললেন, "আনন্দনিকেতন এই গৃহ। আমি এ গৃহ আজ ছেড়ে যাচ্ছি আমেরিকার জনসাধারণের সর্ববাদী সম্মতিক্রমে।" সহাস্যে উচ্চারিত এই কথা কয়টির মধ্যে কোথাও তিক্ততার লেশ মাত্র ছিল না।

উইলসন যাঁদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করবেন, দায়িত্বভার কার্যতঃ গ্রহণ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের নাম ঘোষণা করলেন না। জনরব এবং সংবাদপত্রসমূহ পরমানন্দে নিজেদের মন-গড়া মন্ত্রীসভা নিয়ে খেলা করতে লাগল। এ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা প্রচারিত হলে দেখা গেল, গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ডকে তিনি একদা যে নীতির জন্য সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন, নিজের মন্ত্রীসভা গঠনের বেলায় তিনি অবিকল সেই নীতিই অনুসরণ করেছেন। উইলসনের উক্তি উদ্ধৃত করতে গেলে "গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড বিশ্বাস করেন যে, সরকারী শাসনযন্ত্রে যখন জড়তা ও দুর্নীতি দেখা দেয়, তখন প্রয়োজন হয় তার মধ্যে নূতন শোণিত সঞ্চারিত করার ; নূতন শোণিত বলতে সেই সব স্বার্থ-লেশবিরহিত ব্যক্তিকে বোঝায়, দলীয় প্রভাব যাদের মনে কোন ছাপ ফেলে নি।" একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া এমন সব লোকদের নিয়ে তিনি তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করলেন জনসাধারণের নিকট যাঁরা সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।

সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট	....	উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ান।
সেক্রেটারী অব্ ট্রেজারী	...	উইলিয়াম জি, ম্যাকআডু।
সেক্রেটারী অব্ ওয়ার	...	লিণ্ডলে এম্, গ্যারিসন।
অ্যাটর্ণী জেনারেল	..	জে, সি, ম্যাকরেনল্‌ডস।
পোষ্টমাষ্টার জেনারেল	...	অ্যালবার্ট এস, বার্লেসন।

সেক্রেটারী অব্ দি ন্যাভী	...	জোসেফাস ডেনিয়েলস।
সেক্রেটারী অব্ দি ইন্টিরিয়ার	...	ফ্রাঙ্কলিন কে, লেন।
সেক্রেটারী অব্ এগ্রিকালচার	...	ডি, এফ, হাউসটন।
সেক্রেটারী অব্ কমার্স	....	উলিয়াম সি, রেডফিল্ড।
সেক্রেটারী অব্ লেবার	...	ডব্লিউ বি, উইলসন।

মন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়ে গেলে উদ্বোধন অনুষ্ঠানের ঠিক দুদিন পরে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি প্রচারিত হল ; "প্রেসিডেণ্ট অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছেন যে, কোন পদপ্রার্থীর সঙ্গে তিনি স্বয়ং সাক্ষাত করতে অক্ষম। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবে তখনই প্রেসিডেণ্ট যখন কোন প্রার্থীকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান জানাবেন।" দুর্বহ দায়িত্বের যে বোঝা প্রতিটি প্রেসিডেণ্টের স্কন্ধে চেপে এসেছে, অবশেষে এল তা গ্রহণ ও বহন করবার পালা। রাষ্ট্রীয় অর্ণব-যান বন্দর ত্যাগের জন্য তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

যে যুক্তির ভিত্তির উপর নূতন শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, তা অকাট্য। চাকরীর জন্য হাজারে হাজারে যে সব আবেদন প্রধান কর্মকর্তার টেবিলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে, তার প্রত্যেকটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা তাঁর সাধ্যাতীত। পুরাতন প্রথা অনুযায়ী নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে তাঁর বেশীর ভাগ সময়ই ব্যয়িত হয়ে যায় দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারে এবং তার ফলে সরকারী সেরেস্তার বৃহত্তর কর্তব্যগুলি অবহেলিত অবস্থায় পিছনে পড়ে থাকে। সে প্রথার পরিবর্তন প্রয়োজন। পরিবর্তনই বটে! পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন এই দুইটি কাজ উইলসন শাসনকালের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

উদ্বোধনী ভাষণে যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বড় বড় কথার ফুলঝুরির সাহায্যে অলীক স্বপ্ন-রাজ্য রচনা করার উদ্দেশ্যে তা প্রদত্ত হয় নি। যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন তা পালন করতেই হবে এবং তা করতে হবে অবিলম্বে। কংগ্রেসে ডেমোক্রাটিক দলের সংখ্যাগরীষ্ঠতার যে কি দাম উইলসনের তা অজানা নেই। দুইবৎসরের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে, এই ভেবে তিনি সত্বর কাজে নেমে পড়বার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে জাতীয় আইন সভার এক বিশেষ অধিবেশন

তিনি আহ্বান করলেন। সিনেট এবং হাউস উভয় সভার যৌথ অধিবেশন বসলো ৮ই এপ্রিল তারিখে। সেখানে এক নাটকীয় বিস্ময়কর ঘটনা তাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিল। উড্রো উইলসন সেখানে স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ভাষণ দান করলেন। ওয়াশিংটন এবং অ্যাডাম্‌স এই প্রথাই অনুসরণ করে গেছেন। অ্যাডাম্‌সের আমল থেকে গত একশো বার-বছর ধরে প্রেসিডেণ্ট বিধান-শাখার কাছে তাঁর ভাষণ লিখিত আকারে পাঠিয়ে আসছেন এবং জনৈক কেরাণী জনহীন সভা-কক্ষকে তা পড়ে শুনিয়েছেন একঘেয়ে ও একটানা সুরে। তার পর সে ভাষণ মুদ্রিত আকারে স্থান লাভ করেছে বিপুলকায় কংগ্রেসী রেকর্ডের পৃষ্ঠায়। শতায়ুঃ এই প্রথা জন্মলাভ করে সেই সুদূর অতীতকালে আমেরিকায় সুগঠিত সরকারের যখন সবেমাত্র সূত্রপাত। যুগজীর্ণ সে প্রথার পরিবর্তন সাধন নূতন শাসনতন্ত্রের অন্যতম কৃতিত্ব।

উইলসনের এই অভিনব কলা-কৌশল বাঞ্ছিত ফললাভ করলো। কংগ্রেসে তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতির দরুণ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো তাঁর বাণীর প্রতি এবং তার ফলে সে বাণী স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠলো সচেতন গণ-মনের সম্মুখে। বাণিজ্য শুল্ক ছিল তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কার সমূহের অন্যতম, তাই সে সমস্যার আলোচনা তাঁর ভাষণের বেশ কিছুটা স্থান অধিকার করে। আমদানী শুল্কসংক্রান্ত প্রচলিত নীতি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি তা ছিল সুস্পষ্ট। উইলসন সে নীতির সত্বর পরিবর্তন প্রস্তাব করলেন। প্রয়োজনীয় রাজস্ব আসবে নিম্নাভিমুখে পরিবর্তিত শুল্কনীতি ও প্রবর্তিত আয়কর হতে।

মৌলিক চিন্তাধারা ও অফুরাণ প্রাণশক্তির অধিকারী যিনি, বাণিজ্য-শুল্ক সম্বন্ধে বাণী দান করেই পরিতুষ্ট থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মে মাসে তিনি এই মর্মে এক সাধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন যে, শুল্কনীতির সময়োপযোগী সংস্কার সংক্রান্ত বিল যাতে পাশ না হয় সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের অংশ-বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এই বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণকে সজাগ করে তুললো এবং তার ফলে বাধাদানকারীরা দেখলেন, অতঃপর প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই নিরাপদ। উইলসন আণ্ডারউড-সাইমন্‌স বাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত আইনে স্বাক্ষর দান করলেন ৩রা অক্টোবর তারিখে। বলা বাহুল্য, তিনি যে নীতি নির্ধারণ করেন, এই আইনের সর্তাবলী মূলতঃ তারই অনুরূপ।

রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি পুনরায় কংগ্রেসের সামনে এসে দাঁড়ালেন জুন মাসে। এ ক্ষেত্রে মুদ্রানীতি সংক্রান্ত সংস্কার ছিল তাঁর বক্তব্য বিষয়। বেসরকারী কর্তৃত্বাধীনে ব্যাঙ্ক পরিচালনের যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তিনি তার বিরোধিতা করেন এবং তা করেন এই যুক্তিতে যে, বেসরকারী ব্যাঙ্ক সমূহের উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে; তাছাড়া, সমগ্র জাতির স্বার্থরক্ষার পক্ষে তারা অক্ষম ও অকর্মণ্য; সর্বোপরি, যে শক্তি তারা সংহত করে তুলছে তা প্রায় একনায়কতন্ত্রী স্বৈরাচার সুলভ।

তার পরিবর্তে তিনি এমন এক পরিকল্পনা প্রস্তাব করলেন, যা জাতীয় অর্থের চাহিদা মেটাতে পারবে এবং তার ফলে জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হতে পারবে সমধিক দক্ষতার সঙ্গে। সে পরিকল্পনা ঋণদানের ক্ষেত্রে এনে দেবে অধিকতর স্থিতি-স্থাপকতা। দেশের অর্থ-সম্পদ যাতে এই সব বেসরকারী ব্যাঙ্কে এসে পুঞ্জীভূত না হয় তার পথ বন্ধ করাই ছিল উইলসন-পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সে পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল এই যে, নব প্রবর্তিত প্রথার পরিচালন ভার ন্যস্ত থাকবে সরকারের হাতে। পরিকল্পনাটি যে কেবলমাত্র আকারেই বৈপ্লবিক তা নয়, প্রকারেও ঠিক তাই। কংগ্রেসের যে সব সদস্য পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে মনে মনে সন্দেহ পোষণ করতেন, একটু মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখবার পর তাঁরাও বুঝতে পারলেন যে, প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক-প্রথা তার ঘোষিত উদ্দেশ্য সাধন করতে সমর্থ হবে।

প্রস্তাবিত পরিকল্পনাকে সিনেটে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। যে সব বড় বড় ব্যাঙ্ক-মালিক দেখলেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে তাঁদের শক্তি সঙ্কুচিত হবে, সঙ্গত ভাবেই অবস্থার পরিবর্তন তাঁরা চাইলেন না; কেবল তাই নয়, পরিকল্পনার বিরোধিতা করবার উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছুটে এসে তাঁরা সমবেত হতে লাগলেন ওয়াশিংটনে। তাঁদের প্রভাবের চাপে প্রতিযোগিতার স্থায়িত্বকাল বলে বর্ধিত হয়, কাজেই ২৩শে ডিসেম্বরের পূর্বে তাঁরই নীতি ও কর্মপদ্ধতি সম্বলিত গ্লাস-ওয়েন ফেডারেল রিজার্ভ অ্যাক্টের পক্ষে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর লাভ করা সম্ভব হয়ে উঠলো না। ফেডারেল রিজার্ভ অ্যাক্ট উইলসন নিজে প্রণয়ন না করলেও, সিনেটার গ্লাসের মতে, "ফেডারেল রিজার্ভ প্রথা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে কোন

জীবিত মানুষের অবদান অপেক্ষা ওই একটি মানুষের কৃতিত্ব অনেক বেশী কার্যকর। তাঁর অপরিসীম ধৈর্য্য, তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর অপরাজেয় সাহসিকতা, এক কথায়, মানুষের সেবার জন্য উড্রো উইলসনের ঐকান্তিক আগ্রহ সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে পরাজিত করে, সব বাধা-বিঘ্নকে করে বিদূরীত এবং পরিশেষে তারই ফলে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কিং প্রথা ফেডারেল ষ্ট্যাটিউট গ্রন্থের অঙ্গীভূত হয়।"

নিউ জার্সীর মত ওয়াশিংটনেও উইলসন কাজ করে চললেন নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী। কিন্তু অনন্যচিত্তে কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সমস্যা-সমূহের সমাধান ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ তাঁর হয়ে উঠলো না। মধ্য ও দক্ষিণ-আমেরিকা উত্তর-আমেরিকার শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো, তাদের মনে আশঙ্কা জাগল, হয়তো তারা আক্রান্ত হবে, হয়তো বা উত্তরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের উপর। মেক্সিকো জড়িয়ে পড়লো পারিবারিক বিরোধের এক অস্বাভাবিক জটিলতার মধ্যে এবং সে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিক্রিয়া এসে পৌঁছলো সীমান্তের পরপার অবধি। নানা কারণে ইউরোপের বিভিন্ন জাতিসমূহ আমেরিকার প্রতি ঠিক মৈত্রীভাব পোষণ করত না।

এরূপক্ষেত্রে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতি যদি নূতন করে গড়ে তুলতে হয়, তা হলে কাজ আরম্ভ করতে হবে মহাদেশের ভেতর থেকেই, অর্থাৎ, যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে মেক্সিকো, মধ্য ও উত্তর আমেরিকার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে সহজ ও সচ্ছন্দ করে তুলতে হবে।

পানামা ক্যানাল অ্যাক্টের সর্ত অনুযায়ী যোজক পথে যাতায়াতকারী মার্কিন জাহাজগুলিকে শুল্ক দিতে হত না। উইলসনের মতে এই ব্যবস্থা 'হে-পন্সফোট' চুক্তির বিরোধী এবং সেই কারণে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে চুক্তি বলবৎ থাকবে ততক্ষণ্ গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে মনোমালিন্যের যুক্তিসঙ্গত হেতুও বিদ্যমান থাকবে—উইলসন এ কথা বিশ্বাস করতেন অন্তর দিয়ে। তিনি যথারীতি নিজের বিষয়টি উপস্থাপিত করলেন কংগ্রেসের সম্মুখে এবং যে অবিচার আইনটির মধ্যে নিহিত রয়েছে তার প্রত্যাহারের জন্য দাবি জানালেন উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনের নিকটে। তাঁর দাবির পক্ষে জনমতের সমর্থন থাকায় কংগ্রেসে তদ্দণ্ডে তার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হল।

দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে উইলসন যে নীতি নির্ধারণ করলেন, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের উপর তার প্রতিষ্ঠা। পশ্চিম গোলার্ধের এই দুইটি মহাদেশ কেউ কারও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারা একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এই আদর্শের উপর ভিত্তি করে তাঁর নীতি গড়ে ওঠে। ল্যাটিন-আমেরিকার প্রজাতন্ত্রগুলি কিন্তু আমেরিকার এই নিঃস্বার্থপরতার উপর আস্থা স্থাপন করতে পারছিল না। তৎসত্ত্বেও উইলসন তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করতে লাগলেন যে, অতঃপর একফুট পরিমিত স্থানও জবরদখল করবার ইচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেই।

আলাবামার অন্তর্গত মোবাইলে এক ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "স্বার্থের বাঁধন বিভিন্ন জাতিকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ না করে, বরঞ্চ পরস্পর হতে তাদের বিচ্ছিন্নই করে। বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে কেবলমাত্র সাম্যের ভিত্তিতে।" এরও দু'বছর পরে তিনি বলেন, "সমুদ্রের এই পারে অবস্থিত স্বাধীনতার পতাকাবাহী প্রতিটি দেশের সঙ্গে আমরা সখ্য স্থাপন করেছি সূচনা থেকেই এবং তার ফলে আমেরিকা পরিণত হয়েছে স্বাধীন ও মুক্তি-কামী জাতি এবং ব্যক্তিসমূহের নির্ভর যোগ্য আশ্রয় স্থলে।"

উইলসন সাধারণতঃ বিবেচ্য বিষয়গুলি নিরীক্ষণ করতেন যুক্তির এক উদার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে। এ ভাবে এগোলে খুঁটি-নাটি অন্যান্য বাস্তব বিষয়গুলি যথাসময়ে এসে তাদের যথাযোগ্য স্থান জুড়ে বসবে এই ছিল তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস। উইলসনের মহত্বের এই গোপন জাদুমন্ত্র অনেক সময়ে লোকের দৃষ্টিতে দুর্বলতারূপে প্রতিভাত হত। কিন্তু তথাপি স্বল্পপরিসরে কাজ তিনি কিছুতেই করে উঠতে পারতেন না। যে কোন পরিস্থিতিরই তিনি সম্মুখীন হোন না কেন, তার অন্তর্নিহিত বৃহত্তর দিকটাই তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠত সর্বাগ্রে এবং তাঁর অখণ্ড মনোযোগ একান্তভাবে নিবদ্ধ হত তার উপর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। যেমন করেই হোক, উভয় দেশের মধ্যে শান্তি, সদিচ্ছা ও পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে এ বিষয়ে উইলসনের সঙ্গে সকলেই অবশ্য একমত। কিন্তু উইলসনের দৃষ্টি প্রসারিত আরও দূর ভবিষ্যতের দিকে—যেখানে জেগে রয়েছে 'অনাহত শান্তি এবং

রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব' সম্পর্কে পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির মধুর সুখ-স্বপ্ন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, গড়ে তুলতে হবে এক জাতিসঙ্ঘ এবং তার বাঁধনে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এমন ভাবে আবদ্ধ হবে যে, স্পেনীয় বিজেতা ও ইংরেজ ঔপনিবেশিকগণ তাদের গৌরবময় অভিযানে যাত্রা করবার পর যে ঐক্য বন্ধনের আস্বাদ তারা কোনদিন পায় নি। উইলসন এই ধরণের একটি প্যান-আমেরিকান লীগ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। এই মর্মে একটি চুক্তির খসড়াও রচনা করা হল, কিন্তু যে সব বিরাট পরিবর্তনের কথা এতে প্রস্তাব করা হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট সরকার সমূহ তা মেনে নিতে সম্মত হলেন না।

ঘুমন্ত অশান্তিকে জাগিয়ে তোলা মেক্সিকোর পক্ষে একজাতীয় ক্রীড়া কৌতুকে পরিণত হয়েছিল। নিষ্ফল বিপ্লবের অনুশীলন অশান্ত প্রজাতন্ত্রের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। সংগ্রাম ও স্বৈরাচারের ঐতিহ্যবাহী এমন কিছু সংখ্যক অসহিষ্ণু লোক ছিল যারা মনে করতো, এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে অবস্থা নিজের আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রনাধীনে আনবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগী হওয়া উচিত।

পার্শ্ববর্তী দেশে কি ঘটছে তার সঠিক বিবরণ অবগত হওয়া আমেরিকানদের পক্ষে দুঃসাধ্য। সীমান্ত পার হয়ে যে সব বিবরণ আসত সবই পরস্পর বিরোধী। প্রেসিডেণ্ট চান এমন সংবাদ যা নির্ভরযোগ্য এবং প্রকৃত অবস্থার উপর আলোকপাত করতে সক্ষম। তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের কাজে তাঁর পত্নী তাঁর নিত্য সঙ্গিনী, কাজেই, মেক্সিকোর আভ্যন্তরীন অবস্থা ও ইতিহাস সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান পরিচালনের কাজে তিনি ব্যাপৃত হলেন। বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্রব বহন করে এমন যা কিছু তিনি হাতের কাছে পান তাই পড়েন এবং তাকে সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকার দান করেন পরমদক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে। ফলে, শ্রমসাধ্য সে গবেষণা কার্যে স্বামীকে যে সময়টা ব্যয় করতে হত তা তিনি বাঁচাতে সমর্থ হন।

ইতিহাস অধ্যয়ন করতে গিয়ে উইলসনপত্নী দেখতে পেলেন যে, ছোট ছোট টুকরোতে খণ্ডিত মেক্সিকোর মালিকানা স্বত্ব যখন ছিল জনসাধারণের হাতে, তখনই গিয়েছে তার জীবনের স্বর্ণ যুগ। খণ্ডিত অংশগুলি যুক্ত হয়ে যখন একচেটিয়া জমিদারী গড়ে উঠলো এবং তার ফলে সমগ্র উত্তর মেক্সিকোর মালিকানা চলে গেল আধডজন লোকের হাতে, তার দুর্দিন ঘনিয়ে

এলো তখনই। কেন্দ্রীভূত মালিকানাতে মেক্সিকোর এই রূপান্তরের দরুণই বিপুল সংখ্যক লোকের মধ্যে অসন্তোষ ও অস্থিরতা দেখা দিল। শাসিত ও শোষিতদের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি বশে উইলসন মনে মনে এই আশা পোষণ করতেন যে, এমন দিন একদা আসবে যখন পৃথিবীর সব দেশেই মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর ক্ষীণকণ্ঠ ডুবে যাবে জনসাধারণের মিলিত কণ্ঠস্বরের মধ্যে। জাতি বলতে বোঝায় জনসমষ্টিকে, সরকারকে নয়, কারণ, জাতীয় আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার যে ব্যাখ্যা সরকারের মুখে প্রচারিত হয়ে থাকে তা অনেক সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক প্রশ্নসমূহ নিয়ে তিনি যখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁর এই অভিমত স্পষ্টতর আকার ধারণ করে তখনই।

তাঁর এই মতবাদ মেক্‌সিকোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, স্বৈরাচারী হুয়ের্তা তাঁর নিজের ইচ্ছা আরোপ করেছেন মেক্‌সিকোর জনসাধারণের উপর, কাজেই তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়া উইলসনের পক্ষে সম্ভব হল না। অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার এই নীতিকে তিনি অভিহিত করেন 'সতর্ক প্রতীক্ষা' আখ্যায়। এই নীতির অনুরোধেই দক্ষিণের রাজ্যগুলির পরিচালনদায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করার প্রস্তাব তিনি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারেন নি। তাঁর এই মনোভাব যে প্রাচীন পন্থীদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হবে এ কথা তিনি জানতেন এবং তাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ যে উত্থিত হবে এ কথাও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না, তাই তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন অবিচল ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে। মেক্‌সিকোর জনসাধারণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিতেই হবে-এ অভিমতে তিনি অটল।

১৯১৫ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে জ্যাকসন দিবস উপলক্ষে ইণ্ডিয়ানা পোলিশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন:

মানুষের স্বাধীনতাই একটিমাত্র বিষয় যার সম্বন্ধে আমার উৎসাহ অত্যধিক এবং সে উৎসাহ কোন মাত্রা মানে না। মেক্‌সিকোর ব্যাপারে আমাদের মনোভাব সম্বন্ধে দু-চারটে কথা আমি বলতে চাই। নিজেদের শাসন ব্যবস্থা কি প্রকারের হবে তা, নির্ধারণ করবার অধিকার যে প্রত্যেক জাতির আছে এই মৌলিক নীতিতে আমার আস্থা অটল। মেক্‌সিকোর সাম্প্রতিক বিপ্লব এবং তার ফলে ডিয়াজ সরকারের পতনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত

মেক্সিকোর শতকরা আশীজন লোকই জানতো না—কে তাদের শাসনকর্তা হবে এবং তাদের শাসন ব্যবস্থাই বা হবে কি প্রকারের। আমি সেই শতকরা আশীজন লোকের পক্ষে। তাদের কাজ-কর্ম তারা কি ভাবে চালাবে তা দেখবার অধিকার আমার নেই এবং আপনাদেরও নেই। দেশটা তাদের এবং স্বাধীনতা যদি তারা পায়ই এবং ভগবান করুন তা তারা পাক, তা'হলে সে স্বাধীনতাও হবে তাদের। আমি যতক্ষণ প্রেসিডেন্ট আছি এবং প্রেসিডেন্টের প্রভাব প্রতিপত্তি যতক্ষণ আমার হাতে আছে, ততক্ষণ কেউ তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যে শক্তিমান জাতি বলতে পারে, "এই দেশটাকে যদিও আমরা অনায়াসে দমিত করতে পারি, তবু আমরা এ কথা স্বীকার করি যে, আমাদের নিজস্ব ব্যাপারে আমরা যতখানি স্বাধীনতার অধিকারী, তাদের ব্যাপারে ঠিক সেই পরিমাণ স্বাধীনতাই তাদের আছে," আমি সেই জাতির লোক বলে গর্বিত। সত্যই যদি আমি শক্তিশালী হই, তা'হলে দুর্বলকে পীড়ন করতে আমি স্বভাবতঃই লজ্জা বোধ করবো।

এ দিকে মেক্সিকোর ঝামেলা নিয়ে বিব্রত থাকলেও, প্রেসিডেন্ট তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে যে পরিকল্পনার আভাস দেন তার রূপায়ণের কাজে হাত দিতে তিনি বিলম্ব করলেন না। মুদ্রানীতি এবং শুল্কনীতির সংস্কার তো নিষ্পন্ন হয়েই আছে। এখন জরুরী সমস্যা বলতে রইলো শ্রমিক সমস্যা এবং ট্রাষ্ট সমূহের ক্রমবর্ধমান বিভীষিকা। রুজভেল্ট বৃহদাকার বণিক সঙ্ঘগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন, উইলসন চেষ্টা করতে লাগলেন, তাদেরকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনবার ভিত্তি রচনার কাজটা শেষ করতে। 'ক্লেটন অ্যান্টি ট্রাষ্ট অ্যাক্ট' সেই চেষ্টারই সুষ্ঠু পরিণতি। ট্রাষ্ট সমূহের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যকরী ব্যবস্থা এবং শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্বন্ধীয় বিবিধ বিধি-বিধান এই অ্যাক্টের অঙ্গীভূত। এই অ্যাক্ট প্রবর্তনের ফলে ধর্মঘট ও বয়কট আন্দোলন আর বে-আইনী বলে বিবেচিত হল না, অথচ বে-আইনী বলে ঘোষিত হল সেই আদেশ, যার বলে শ্রমিকদের কিছু করতে বা না করতে বাধ্য করা যায়; ট্রাষ্ট সমূহের উপরে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে সব বিধি-নিষেধ আরোপিত হল, শ্রমিকদের বেলায় তার কোন বাধ্য-বাধকতা রইল না। দূরপ্রসারী এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্তিত হল ফেডারেল ট্রেডকমিশন অ্যাক্ট।

পরবর্তী কালে রেলওয়ে ধর্মঘটের আশঙ্কা দেখা দিলে 'অ্যাডামসন ল' নামে আর একটি আইন শ্রমিক আইনের অঙ্গীভূত হয়। এই আইনের বলে শ্রমের সময় ধার্য হয় দিনে আট ঘণ্টা। সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা-মূলক ব্যবস্থা হিসাবে গভর্ণমেণ্ট চেষ্টা করলেন নিজস্ব একটা বাণিজ্য নৌবহর গড়ে তুলতে। দুর্ভাগ্যক্রমে দুঃসাহসিক সে পরীক্ষার ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়।

এই সব গুরুগম্ভীর ঘটনাকে লঘু করে তোলবার জন্য মাঝে মাঝে রঙ্গ-রসিকতার অভিনয় যে না হত তা নয়। উইলসনের স্কচ-আইরিশ বংশের ঐতিহ্য এই সব রসিকতার খোরাক যুগিয়ে জীবনকে হাস্য-মুখর করে তুলত। তিনি যখন অফিসে বসে চিঠিপত্র লেখা, বক্তৃতা তৈরী, পরিকল্পনা ছকা এবং আইন প্রণয়নের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন, ওয়াশিংটন তখন তাঁকে লক্ষ্য করতো প্রদর্শনীয় এক বিচিত্র জীবরূপে। তাঁর দৈনন্দিন কাজ-কর্ম সম্বন্ধে গড়ে তুলত নানা রকমের কাহিনী। রাজধানীর অবসর বিনোদনের এই ঔৎসুক্য প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি এড়ায় নি। প্রেস ক্লাবে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি একদা এইরূপ মন্তব্য করেন যে, জনসাধারণ কেন যে তাঁর সম্বন্ধে এত কৌতূহলী সে কথা তিনি বুঝে উঠতেই পারেন না। প্রেসিডেণ্ট তো কোন একজন ব্যক্তি বিশেষ নন, তিনি একজন কর্মচারীমাত্র। কাজেই যে মুহূর্তে তাঁর কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি আর প্রেসিডেণ্ট নন, তখন তিনি উড্রো উইলসন। কিন্তু জনসাধারণ তাঁকে 'উড্রো উইলসন' কিছুতেই হতে দেবে না।

পুলকিত শ্রোতাদের সম্বোধন করে সহাস্যে তিনি বললেন, নিজের এত বিভিন্ন রকমের ছবি তিনি দেখেছেন, নিজের সম্বন্ধে এত বিচিত্র ধরণের কাহিনী তিনি শুনছেন যে:

মাঝে মাঝে জনসাধারণের দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষপাত না করে আমি থাকতে পারি না। সে কটাক্ষের ইঙ্গিত হল এই যে, 'তোমরা এই সব কাণ্ড-কারখানা যা কিছু দেখছো তার পিছনে কিন্তু আমি আছি, কখনও কখনও এমন আনন্দময় মুহূর্ত আমার জীবনে আসে যখন আমি ভুলে যাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমি প্রেসিডেণ্ট। চমকপ্রদ গোয়েন্দা গল্প আমার মনে সে সাময়িক বিস্মৃতি ঘটায়। কাল্পনিক এক অপরাধীর পিছনে আমি রুদ্ধশ্বাসে

ছুটে চলি অন্য কোন এক মহাদেশে। এ মহাদেশের নিভৃততম প্রান্ত পর্যন্ত আমার চেনা বলে এখানে অপরাধীর অনুধাবন করতে আমার ভালো লাগে না। এখানকার ডাকঘর ও অন্যান্য যে সব বস্তু অন্তরের সুপ্ত-স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, সে সব ঢাকা পড়ে গেছে চিন্তার পাণ্ডুর এক আচ্ছাদনের তলে।

কর্মজীবনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে হয়তো একদিন ওয়াশিংটন দেখতে আসবো। কিন্তু যতদিন তা না হয়, ততদিন আমি জাতীয় মিউজিয়াম, মনুমেণ্ট, স্মিথমোনিয়ান ইনষ্টিটিউশ্যান অথবা কংগ্রেস লাইব্রেরীর পর্যায়ভুক্ত বস্তু। এখানে প্রেসিডেণ্টও এক দর্শনীয় বস্তু। আমি অবশ্য সময়-বিশেষে অন্য চেহারা ধারণ করতে যে না পারি তা নয় এবং যখন তা করি, তখন বাইরের চেহারা দেখে লোকে টেরই পায় না যে, ভেতরে কি চলছে। তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই কলা-কৌশল অভ্যাস করি যার সাহায্যে চেহারাটাকে ঠিক মনুমেণ্টের মত করে তুলতে পারবো। যুক্তরাষ্ট্রের সমুদায় জনসংখ্যার সঙ্গে করমর্দন করা অপেক্ষা জাতীয় প্রদর্শনীর দর্শনীয় সামগ্রী সেজে বসে থাকা অবশ্য অনেক সহজ।

যে উইলসন সম্বন্ধে এতো বিচিত্র কথা ও কৌতুকপ্রদ কাহিনী প্রচারিত, তাঁর অনাচ্ছাদিত ও অকৃত্রিম চেহারা এই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেহরক্ষীর সঙ্গে প্রেসিডেণ্টের অশ্বারোহণের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য। দুজনায় ঘোড়ায় চেপে যেতে যেতে প্রেসিডেণ্ট এক সময়ে একটু পিছিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে আবার দেহরক্ষীর কাছাকাছি এসে গম্ভীরভাবে বললেন, পিছনে ওই যে ছেলেটাকে দেখছো—ও আমাকে মুখ ভেঙচাচ্ছিলো।

মিঃ প্রেসিডেণ্ট, ওর সঙ্গে কথা কইবো না কি ?

আরে না না, আমিও ওকে উল্‌টে ভেঙচে দিয়েছি।

উইলসন পরিবারের বন্ধুস্থানীয় জনৈক ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা আর একটি ঘটনা; উইলসন-দুহিতা মার্গারেট একদিন নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যাবেন। যাত্রার পূর্বে টেলিগ্রাম করে তিনি পিতাকে জানালেন যে, ট্রেণের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি থাকবেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়শঃই রহস্যজনক যে রকম ঘটনা ঘটে থাকে, এ স্থলেও তাই ঘটলো; প্রেরিত হবার পথে তারবার্তা বিকৃতি লাভ করলো বিশ্রীভাবে। পরের দিন সকালে প্রাতরাশের

সময়ে উইলসন কন্যাকে সম্বোধন করে বললেন, "মার্গারেট, কাল তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে রীতিমত ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলাম। টেলিগ্রামে ছিল, তুমি নাকি ওয়াশিংটনে আসছ দ্বিখণ্ডিত অবস্থায়।"

তাঁর পরিজনবর্গ যখন কোথাও যেতেন, আর সব ছা-পোষা মানুষের মতো তিনিও ষ্টেশনে যেতেন তাঁদের বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য। কিন্তু রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যাঁদের দৃষ্টিতে কলের পুতুল মাত্র, তিনি যে তারের টানে চলবেন-ফিরবেন তার সঙ্গে জীবন্ত মানুষের কোন সংশ্রব থাকবে না, যাঁদের ধারণা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হবেন দেহহীন, ভাবাবেগহীন জড়পিণ্ড বিশেষ, প্রেসিডেন্টের এই আচরণ তাঁদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো।

বোষ্টনের জনৈকা মহিলা অনুযোগ করলেন, "পত্নী এবং কন্যারা যখনই কোথাও যান, প্রেসিডেন্ট তখনই ষ্টেশনে যান তাঁদের বিদায় দিতে—এ একটা অত্যন্ত অশোভন ব্যাপার।"

নিম্নলিখিত পাঁচ লাইনের কবিতাটির রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। ক্ষেত্র বিশেষে কবিতাটি তিনি আবৃত্তি করতেন ঃ

তারকার মত সুন্দর আমি নই
আমার চেয়ে আরও সুন্দর মানুষ অনেক আছে ;
আমার মুখের কথা বলছো ? ওটা আমি গ্রাহ্যই করি না,
কারণ, আমি আছি মুখের পিছনে,
তার প্রথম ধাক্কা লাগবে তাদের গায়ে
যারা আছে সামনে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু কলের পুতুল সেজে বসে থাকতে উইলসন সম্মত নন। জীবনের আনন্দময় দিনগুলি তিনি যাপন করেছেন পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই। কর্মবিরত সে বিশ্রামকালীন আনন্দের বিনিময়ে হোয়াইটহাউসকে রাজনৈতিক ক্লাবে পরিণত করার অনিশ্চিত আনন্দ বরণ করে নিতে তিনি প্রস্তুত নন। রাজনীতিকরা বলতেন, অত্যন্ত অমিশুক ও বড়লোক-ঘেঁষা। তাঁদের নালিশ ছিল এই যে, প্রেসিডেন্ট সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে নারাজ। এই সব মন্তব্যের জবাবে প্রেসিডেন্ট কিন্তু একটি কথাও বলতেন না। রাজনীতিকদের এড়িয়ে চলার উদ্দেশ্য তাঁর আদৌ

ছিল না। তবে কি না, তিনি মনে করতেন, কাজের যে অত্যধিক চাপ তাঁর পদাধিকারের পক্ষে অপরিহার্য, তার গুরুভার যদি লাঘব করতে হয়, তা'হলে তাঁর পক্ষে প্রয়োজন বিশ্রামের ও অবসর বিনোদনের।

এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে আহারের সময়ই ছিল উইলসনের পক্ষে প্রকৃষ্টতম সুযোগ। এই সময়ে রাজনীতি অথবা হাট-বাজারের প্রসঙ্গ উত্থাপন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তার পরিবর্তে আলাপ-আলোচনাকে আপন মনে ভেসে চলতে দেওয়া হত কখনও সাহিত্য, কখনও সঙ্গীত, কখনও শিল্প অথবা অন্য কখনও বা তাঁর প্রিয় বিভিন্ন বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোন একটির দিকে।

একদিন তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছেন, আনন্দ উছলে পড়ছে তাঁর চোখ-মুখ দিয়ে। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "অত্যন্ত ফুর্তিবাজ একজন পশ্চিমদেশীয় লোকের সঙ্গে বাক্যালাপ হল।" অতঃপর তিনি লেগে পড়লেন লোকটির বর্ণনা দিতে এবং তা দিতে গিয়ে তিনি বিশেষভাবে জোর দিলেন তার সেই মন-খোলা ব্যবহারের উপর যেটা তার এমন একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উইলসন যা ভালোবাসতেন অথচ যার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ঘটত ক্বচিৎ কখনও। তার কারণ, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তাঁরা নিজেদের আবৃত করে রাখতেন এমন একটা ছদ্ম আবরণের আড়ালে যা ভেদ করে তাঁদের প্রকৃত স্বরূপ বেরিয়ে আসবার পথ পেত না। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মন খুলে কথা কয় এমন সাধ্য কার?

কিন্তু তরুণ এই আগন্তুকটি ভিন্ন চরিত্রের লোক। প্রেসিডেন্ট-সুলভ পদমর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দূরে থাক, তিনি সোজা এগিয়ে এলেন এবং একটানে উইলসনের গলার টাইটা খুলে নিয়ে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। তারপর নিজের টাইটা খুলে দুজনায় অত্যন্ত গুরু-গম্ভীর ভাবে নিজেদের টাই দুটোর গুণাগুণ সম্বন্ধে তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন। এই ধরণের ঘটনাই উইলসনকে আনন্দদান করত।

ক্রমেই তাঁর এই অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগলো যে, গড়পড়তা লোকের জীবনে যে আনন্দ প্রেসিডেন্টের পক্ষে তা প্রাপ্য নয়। প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, অন্তরঙ্গতা, নির্দায় স্বাধীনতা এবং সামাজিক আচার পদ্ধতি তাঁর জন্য নয়। উইলসনের অক্লান্ত বন্ধু কর্ণেল হাউস হোয়াইটহাউসে প্রায়ই আসতেন।

সেখানে একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহস্বামীর সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয় তা ডায়েরীতে তিনি লিপিবদ্ধ করেন। তিনি প্রেসিডেণ্টকে সেদিন বলেন যে, বিশ্রাম গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। উত্তরে প্রেসিডেণ্ট বলেন, তিনি বুঝতে পারছেন যে, লোকে তাঁকে হত্যা না করে ছাড়বে না। তিনি সবিস্তারে বিবৃত করেন তাঁর নিঃসঙ্গ-জীবনের দুঃখ-দুর্ভোগময় কাহিনী।

এই নিঃসঙ্গতার পীড়ন তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে একটি লিখিত ভাষণ পকেট থেকে বের করে তিনি পড়ে শোনাতে লাগলেন। লিঙ্কনের জন্মস্থানে পড়বার উদ্দেশ্যে ভাষণটি লেখা হয়:

কি ব্যষ্টির, কি সমষ্টির, কি নিজের, কি অপরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার যাঁর হাতে, বিবেকের নির্দেশক্রমে তাঁকে এমন এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতা বহন করতে হয়, যা পবিত্র অথচ পীড়াদায়ক। সে নিঃসঙ্গতা ভঙ্গ করবার অধিকার কারও নেই। কারও সাধ্য নেই যে, সত্যের অনুসন্ধিৎসুকে তার অভিযানে সহায়তা করে।

তাঁর পাঠ শেষ হয়ে যাবার পর সমস্ত যায়গাটা দীর্ঘস্থায়ী নীরবতায় থম্ থম্ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মৌনতা ভঙ্গ করলেন তাঁর কন্যা মার্গারেট। মার্গারেট জানতে চাইলেন, তাঁর পিতা লিঙ্কনের মনের কথা জানতে পারলেন কেমন করে? জবাবে পিতা বললেন, "জানতে পারলাম সম্ভবতঃ এই কারণে যে, জন-নায়ক মাত্রেরই জীবনে যে নিঃসঙ্গতার নিতান্ত প্রয়োজন তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে।"

এই সময়ে উইলসনের জীবনে আর এক নূতন ধরণের নিঃসঙ্গতা নেমে আসে, সে নিঃসঙ্গতা যেমন শোকাবহ, তেমনি মর্মান্তিক। তাঁর পত্নী পরলোক গমন করেন ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে। মৃত্যু যতই নিকটবর্তী হয়ে আসে, তাঁর মন ততই চিন্তাকুল হয়ে ওঠে স্বামীর কথা ভেবে। "শপথ করুন, আমি চলে গেলে আপনি উড্রোর উপরে লক্ষ্য রাখবেন" গৃহ চিকিৎসকের কাছে তাঁর জীবনের এই শেষ কথা। রোমের সেই ছোট্ট গীর্জায় এলেন অ্যাক্‌সনের সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম সাক্ষাত। মনে হয়, সে যেন জন্মান্তরের কথা। প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যুতে শোকে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। অতি অল্প সংখ্যক দাম্পত্যজীবনই এমন মধুময় হয়, আত্মার সঙ্গে আত্মার এমন একান্ত মিলন কদাচিৎ ঘটে। কয়েক মাস ধরে শোকভার

প্রেসিডেন্টের পক্ষে এমন দুর্বহ হয়ে ওঠে যে, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে তা' শঙ্কার হেতু হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন, নির্জনতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে বেরিয়ে আবার লোকজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে। অবশেষে তাঁর শুভার্থীরা শুনে সুখী হলেন যে, তাঁর জীবন-ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচিত হতে চলেছে। মিসেস্ এডিথ বোলিং গল্টের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। মিসেস্ গল্ট তাঁরই মত ভার্জিনিয়ার অধিবাসী। তিনি সেই পোকাহোন্‌টাস বংশের মেয়ে, গোড়ার দিকে আমেরিকাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে বংশ এক বিশিষ্ট ভূমিকা অভিনয় করে।

১৯১২ সালে ডেমোক্রাটিকদলের হাতে শাসন ক্ষমতা আসার পর থেকে প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মেয়াদের প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলন চলে আসছিল। অনেকের মতে, মেয়াদ হবে ছয় বছর এবং তার পরে তিনি আর পুনঃ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এ সম্পর্কে উইলসনের নিজস্ব ঘোষণা নিম্নলিখিত রূপ :

যে প্রেসিডেন্ট জনসাধারণের সত্যকার মুখপাত্র নন এবং যিনি নেতৃত্বও করেন না, পরন্তু জনসাধারণের স্কন্ধে যাঁকে আরোপ করে দেওয়া হয়, তাঁর কার্যকালের চার বছর মেয়াদ অত্যন্ত দীর্ঘ। কিন্তু যে প্রেসিডেন্ট এমন এক বিরাট সংস্কার সাধনের কাজে ব্যাপৃত যে, তা সম্পন্ন করবার মত সময় তিনি পেয়ে উঠছেন না, তাঁর পক্ষে এ মেয়াদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

গত চার বছরে উইলসন অবশ্য করেছেন অনেক কিছু, কিন্তু তবু আরও বহু কিছু করতে বাকী রয়ে গেছে। কর্ণেল হাউস এ সম্পর্কে অ্যামবাসাডার পেজ্‌কে লেখেন :

লিঙ্কনের পর আর অন্য কোন প্রেসিডেন্টই দায়িত্বের এমন গুরুভার বহন করেন নি। আমার বিশ্বাস, আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট রূপে না হলেও শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্টদের মধ্যে অন্যতম রূপে ইনি ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রাটিক্ সম্মেলনে কর্ণেলের এই মতই স্বীকৃত হয়েছিল। সেণ্টলুইতে অনুষ্ঠিত সে অধিবেশনে বিপুল সম্বর্ধনা সহকারে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন ১৬ই জুন তারিখে।

ছয়

উভয় সঙ্কটের মাঝখানে

১৯১৪ সাল। গ্রীষ্মকাল-সুলভ জড়তা তখন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরেছে। গ্রীষ্মকালীন ছুটির জন্য ষ্টেট এবং ফেডারেল উভয় বিধান সভাই বন্ধ, এমন কি, রাজনীতিকরা পর্যন্ত কর্মচাঞ্চল্য হতে বিরত হয়েছেন। যে সব খুন এবং কেলেঙ্কারীর ঘটনা বিশ্বতশ্চক্ষু সাংবাদিকদের জালে ধরা পড়ে গেছে, সংবাদপত্র পাঠকদের একমাত্র উপজীব্য হয়ে উঠেছে সেইগুলি। ২৮শে জুন তারিখে এক হত্যাকাণ্ড ঘটে, নূতনত্বের দিক থেকে যার বিবরণ পাঠ-যোগ্য! অষ্ট্রীয়ার আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ড এবং তাঁর পত্নী সার্বিয়ায় নিহত হয়েছেন।

এর আগে আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ডের নাম কি কেউ কোন দিন শুনেছে? অন্ততঃ যুক্তরাষ্ট্রে কেউ কোন দিন তাঁর নাম কাণেও শোনেনি। কাজেই এই ঘটনার এক মাস পরে অষ্ট্রীয়া যখন হত্যাকাণ্ডের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, লোকে তখন বিস্মিত না হয়ে পারল না। এরপর থেকে একের পর এক ঘটনাগুলি যে ভাবে ঘটে চলল তা বিস্ময়কর ও বিভ্রান্তিজনক। পৃথিবীর শান্ত ও স্বচ্ছ পরিবেশ সহসা হয়ে উঠল আরক্তিম।

রুশ সরকার সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন ৩০ শে জুলাই তারিখে। পয়লা আগষ্ট জার্মানী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হল তার দু'দিন পরে এবং বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তার পরের দিন। একজন অখ্যাত ও অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করে সমগ্র ইউরোপ হয়ে উঠল উন্মাদ। বেলজিয়ামকে আক্রান্ত হতে দেখে সমগ্র বিশ্ব সভয়ে শিউরে উঠল, বিশ্বশান্তি আলোড়িত হয়ে উঠল যুদ্ধের উন্মত্ত তাণ্ডবে। সারা বিশ্বটা মনে হল যুদ্ধমান জাতিসমূহের সৈন্য শিবিরে পরিণত হয়েছে। পরিণামে যাই ঘটুক না কেন, তারা যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল এবং প্রতীক্ষা করছিল এই ক্ষণটির জন্য।

বিদ্যুতের গতিবেগ সম্পন্ন যে রূপান্তর ইউরোপের একটা বিশাল অংশকে বিপর্যয়ের আবর্তে নিক্ষেপ করতে উদ্যত, বিভিন্ন দিক থেকে প্রচারিত পরস্পর বিরোধী সব সংবাদের চাপে পড়ে তার হেতুটা গোড়ার দিকে কিছুটা আবছা ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আজ যে তথ্যকে মনে হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ও চাঞ্চল্যকর, কাল তা নবতর তথ্য ও তত্ত্বের প্লাবন মুখে কোন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। যা ঘটছে এবং যে কারণে তা ঘটছে তার একটা সুস্থ হিসাব-নিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে, সঠিক বিচার বিশ্লেষণের জন্য যে শান্ত নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োজন, তা নিঃশেষে সমাহিত হয়ে গিয়েছিল জাতিগত বিদ্বেষ ও বিরুদ্ধতার পাষাণ স্তূপতলে। বিদ্বেষ ও ক্ষিপ্ত কর্মচাঞ্চল্য যুদ্ধ থেকেই জন্মলাভ করে এবং আসল সমস্যাকে আচ্ছন্ন ও আড়াল করে দেয় যুদ্ধজাত প্রচার কার্য। যুদ্ধোন্মত্ত পরিবেশের মধ্যে সত্যের সাক্ষাত লাভ দুর্লভ।

অষ্ট্রীয়ার আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যেই যে এই সব ঘটনা ঘটে চলেছে এমন কথা মনে করবার কোন হেতু ছিল না। বরঞ্চ শক্তির ভারসাম্য রক্ষার জন্যই পুরাতন যুদ্ধ বিগ্রহের এই পুনরাবৃত্তি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি লাভ করছিল।

যুযুধান পক্ষদ্বয়ের মধ্যে এক পক্ষে দাঁড়ায় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং পরে ইতালি এবং অন্যপক্ষে স্থানলাভ করেছে জার্মানী ও অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী।

বিক্ষুব্ধ বলকান রাজ্যগুলি উভয় পক্ষের সীমান্ত-রেখার উপরে দোলায়মান। গোপন কূটনীতির বেড়াজালে তারা এমন অসহায় ভাবে আবদ্ধ যে, তাদের যে কোন একটিকে স্পর্শ করবামাত্র সমগ্র সৌধটি সমূলে ভেঙ্গে পড়বে।

ইউরোপের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করে যুক্তরাষ্ট্রের মনে প্রথমে জেগেছিল বিস্ময়, কিন্তু বেলজিয়ামকে বলি প্রদত্ত হতে দেখে বিস্ময় রূপান্তরীত হল বিক্ষোভে। তবু এ সব ব্যাপারে আমেরিকার সক্রিয় কোন অংশ ছিল না। প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এখনও পর্যন্ত আমেরিকা বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে এসেছে, কাজেই ইউরোপের গোলযোগের আঁচ কোন দিন তার গাত্র স্পর্শ করে নি। বৈদেশিক সংঘর্ষে লিপ্ত হবার দায় থেকে তাকে রক্ষা করে এসেছে তার ভৌগোলিক দূরত্ব।

১৮ই আগষ্ট তারিখে প্রেসিডেন্ট উইলসন আমেরিকার জনসাধারণকে সতর্ক করে দেবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ঘোষণা বাণী প্রচার করলেন :

মানুষের প্রাণ নিয়ে যে হানাহানি সুরু হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সে সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। সে নিরপেক্ষতা আমাদের রক্ষা করে চলতে হবে কথায় এবং কাজে। আমাদের যে কোন ভাবাবেগ অথবা কার্যকলাপ যে কোন দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব রূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে, তাকে আনতে হবে কঠোর নিয়ন্ত্রণের অধীনে।

যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়জন ব্যক্তি বিশ্ব-যুদ্ধের বার্ত্তা শুনে বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যান নি, প্রেসিডেন্ট তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ইউরোপীয় জনতার যুদ্ধবাদী অংশের মধ্যে যে অশান্ত আলোড়ন চলছিল, তার আওয়াজ প্রেসিডেন্টের কাণে এসে পৌছেছে অনেক আগেই। উইলসনের মতে, বিশ্ব-বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থের ভূমিকা অভিনয় করাই হবে আমেরিকার কাজ। তাঁর সেই ধারণার সত্যতা পরীক্ষার সময় সমুপস্থিত। ১৯১৪ সালের বসন্তকালের গোড়ার দিকে বিশ্বের ঘটনা-স্রোত যখন বয়ে চলেছে নিস্তরঙ্গ স্রোতে, প্রেসিডেন্ট তখন কর্ণেল হাউসকে ইউরোপে প্রেরণ করেন সরকারীভাবে নয়। তাঁর ব্যক্তিগত দূত ও প্রতিনিধিরূপে। ইউরোপের অশান্ত জাতিসমূহের উদ্দেশ্যে তিনি জ্ঞাপন করেন অস্ত্র হ্রাসের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। কিন্তু তাঁর দূত ইউরোপ থেকে যে বার্ত্তা বহন করে আনেন তা

আদৌ আশাপ্রদ নয়। কর্ণেল হাউস বললেন, "ইউরোপের প্রতিটি দেশ আর সব দেশ সম্বন্ধে শঙ্কায় ও সন্ত্রাসে দিন যাপন করছে। রণোন্মাদনায় সারা দেশ উদ্দাম ও উন্মত্ত।"

স্যর এডওয়ার্ড গ্রে-ই (পরবর্তীকালে লর্ড গ্রে) একমাত্র ব্যক্তি—যিনি একাকী অরণ্যে রোদন করছিলেন। তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা কাম্যতম বস্তু শান্তি। তিনি বলেছিলেন, তিনি একবার যদি জার্মানদের সঙ্গে কথা-বার্তা কইতে পারেন, কোনরকমে একবার যদি তাদের রাজি করাতে পারেন আলোচনা সভায় মিলিত হতে, তাহলে পরিস্থিতির চেহারা পরিবর্তিত হয়ে যেত। এই ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিক উইলসনের মতই আস্থাবান ছিলেন মধ্যস্থতার উপর এবং উদ্‌গ্রীব ছিলেন তার কার্যকারিতা পরীক্ষা করবার জন্য। তবু বিপদ যে পরিমাণ গুরুতর ও বিপদ-সম্ভাবনা যে রকম আসন্ন বলে কর্ণেল হাউস বিবরণ দাখিল করেছিলেন, অবস্থা যে সত্যসত্যই সেরকম সঙ্গীন, অথবা বিপর্যয় যে সেই রকমই আসন্ন প্রেসিডেন্টের তা মনে হয় নি। পরস্পর বিরোধী পক্ষদ্বয়ের দুই প্রধানের মধ্যে দেখা-সাক্ষাত ঘটাবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল বার্লিনের পথে যাত্রা করলেন।

কাইজারের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয় এবং কাইজার তাঁকে বলেন যে, ইংলণ্ডের প্রতি তিনি বিশেষ বন্ধুভাব পোষণ করেন এবং তিনি একান্ত ভাবে কামনা করেন শান্তি, কিন্তু জার্মানী চতুর্দিক থেকে বিপন্ন। এই রকম শঙ্কা ও সংশয় যেখানে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেখানে যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, শান্তির ললিতবাণী সেখানে নিরর্থক। ইউরোপের উত্তেজনার বারুদ স্তূপ একটি স্ফুলিঙ্গ স্পর্শের জন্য প্রতীক্ষা করছিল এবং সে স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করে দিল আর্কডিউকের হত্যাকাণ্ড।

সরকার তাঁদের নিরপেক্ষতার নীতি যতো নিষ্ঠার সঙ্গেই অনুসরণ করুণ না কেন, পয়লা আগষ্ট তারিখে যে চূড়ান্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল, তারপর ইউরোপের ঘটনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন থাকা আর সম্ভব হল না। আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য যে ভাবে ব্যাহত হচ্ছিল তাতে করে অচিরে যে সে বাধা বিপজ্জনক আকার ধারণ করবে সে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো ডিসেম্বর মাস নাগাদ। অবাক্ কাণ্ড! প্রথম সংঘাত ঘটে গেল গ্রেটবৃটেনের সঙ্গে। তল্লাসীর জন্য আমেরিকার জাহাজ আটক করা হল এবং সেই

জাহাজ যে মাল বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল জার্মানীতে, সে সব সরিয়ে ফেলা হল। কার্যতঃ অবলম্বিত হল অবরোধ ব্যবস্থা।

লণ্ডন ঘোষণা পত্রের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করে উইলসন নিরপেক্ষ জাতির বাণিজ্য জাহাজ আটক করার বিরুদ্ধে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বৃটিশ-গভর্ণমেন্টের কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে পাঠালেন। আন্তর্জাতিক আইন ঘটিত এই প্রতিবাদ খণ্ডন করবার জন্য বস্তুতঃ কোন চেষ্টাই হল না। গ্রেটবৃটেন অবশ্য এই যুক্তি দেখাল যে, যেহেতু সমুদ্রপথে নূতন উপদ্রবরূপে ডুবো জাহাজের আবির্ভাব হওয়ার ফলে সামুদ্রিক পরিস্থিতির সমূহ পরিবর্তন ঘটেছে, সেই কারণে ইংলণ্ডকে তদনুযায়ী প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যবস্থারও পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছে। অতঃপর ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ-দ্বীপপুঞ্জের চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চলকে জার্মানী যুদ্ধ এলাকারূপে ঘোষণা করল, ফলে নিরপেক্ষ জাতির পক্ষে নিরাপদে চলা-ফেরা হয়ে উঠল আরও দুষ্কর।

প্রেসিডেণ্টকে রাষ্ট্রীয়-তরণী বেয়ে নিয়ে যেতে হল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র পথে। সময় যত যেতে থাকে, তাঁর দায়িত্ব হয়ে উঠে ততই দুর্বহ। কারণ, যে-ইউরোপীয়-যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে উদ্যত, মার্কিন জন-সাধারণের সহানুভূতি তার কোন না কোন পক্ষের দিকে ক্রমশঃই ঝুঁকে পড়ছিল। জনতার জঙ্গী মনোভাবাপন্ন অংশটার মনে প্রতীতি জন্মাল যে, বেলজিয়ামের উপরে যে অন্যায় ও অত্যাচার করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই মুহূর্তে যুদ্ধে নেমে পড়া উচিত। অন্য অংশের অভিমত হল এই যে, বহির্জগতে যা ঘটেছে, তার সঙ্গে আমেরিকার কিছুমাত্র সংশ্রব নেই। ইউরোপ যদি আত্মহত্যার পথে পা বাড়িয়ে থাকে, তা'হলে আসন্ন বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার দায়িত্ব ইউরেপীয় জাতিসমূহেরই। তৃতীয় আর এক পক্ষ, এবং সে পক্ষই সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিক, সমগ্র ব্যাপারটা সম্বন্ধে ঔদাসিন্য বজায় রেখে চলল।

জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ যে হস্তক্ষেপের বিরোধী এবং তারা যে নিরপেক্ষতার নিরাপদ-বন্দর আশ্রয় করে থাকার পক্ষপাতী উইলসন সে কথা ভালোভাবেই জানতেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে সম্বোধন করে তিনি তাই বলেন:

যখনই আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিহ্বল ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি তখনই আমি

স্মরণ করতে চেষ্টা করি, দেশের লোক কি ভাবছে। আমার মনে হয়, বর্তমানে 'আমেরিকা সর্বাগ্রে' এই কথা কয়টিই আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের স্বরূপ নির্ধারণের পক্ষে মূলনীতি হওয়া উচিত। আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-বুদ্ধির বশে আমি এ-কথা বলছি না।

ইংলণ্ডের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ ঘটে যাবার পর উইলসন ডুবো-জাহাজী কর্মতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জার্মানীর কাছে এক পত্র প্রেরণ করেন। পত্রের মারফতে তিনি এই কথাই জানিয়ে দিলেন যে, ডুবো-জাহাজী উপদ্রবের দরুণ মার্কিন জাহাজ অথবা মার্কিনী স্বার্থের যদি কোন ক্ষতি সাধিত হয়, তা হলে সে ক্ষতি পূরণ করবার সমূহ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে জার্মান গভর্ণমেণ্টের উপরে। কিন্তু জার্মানী যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে ডুবো জাহাজের কার্যকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করছে, তাই তার সুবিধে গ্রহণ করার সুযোগ হতে নিজেকে বঞ্চিত করতে সে নারাজ। তার বক্তব্য হল, নিরপেক্ষ জাতিসমূহের যদি এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি থাকে, তাহলে তাঁরা এ পথ এড়িয়ে চললেই পারেন। কাজেই, সাগরের অতলে সামুদ্রিক দৈত্যের ধ্বংসাত্মক উপদ্রব চলতেই থাকল অব্যাহত গতিতে। ঘটনা-প্রবাহের চরম পরিণতি ঘটল ১৯১৫ সালের ৭ই মে তারিখে: আতলান্তিক পারাপারকারী 'লুসিতানিয়া' নামক যাত্রীবাহী জাহাজ মাস্তলের উপরে বৃটিশ পতাকা তুলে যাবার সময়ে জার্মান ডুবো-জাহাজ কর্তৃক টরপেডোর আঘাতে নিমজ্জিত হয় এবং তার ফলে এগারো শো লোকের জীবন হানি ঘটে। নিমজ্জিত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শত চার জন ছিল আমেরিকান। এই নিদারুণ বিপর্যয়, এতগুলি নিরপরাধ লোকের এই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড ব্যাপক আকারে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুললো সারা দেশময়।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক-অধিকার সদ্য অর্জন করেছে এমন কিছু সংখ্যক লোকের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনদিন পরে প্রেসিডেণ্ট বলেন, "এমন কোন কোন ঘটনা ঘটে যার জন্য যুদ্ধ করা জাতির পক্ষে গৌরবজনক। এমন কোন কোন কাজ জাতি করে যার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না।" তাঁর সে-ভাষণ যদিও পঠিত হল ব্যাপকভাবে, কিন্তু সরকারী নীতির সার্থকতা যারা উপলব্ধি করতো না, কিম্বা তার প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পোষণ করতো না, তাঁর 'গৌরবজনক যুদ্ধ' সংক্রান্ত উক্তি

তাদের কাছে হয়ে উঠল ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বস্তু। এমন কিছু সংখ্যক লোকও ছিল যারা উইলসনের নিবিড় ঐকান্তিকতায় বিশ্বাসবান। তাঁদের বিশ্বাস, সরকার তাঁদের নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখেও, জার্মানীর নির্বিচার সংগ্রাম-পদ্ধতির ফলে সাধিত ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণে সমর্থ হ'বেন। যুক্তরাষ্ট্রকে উপলক্ষ করে আতলান্তিক হতে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি যে বিতর্কের ঢেউ জেগে উঠলো, তা প্রশমিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

চতুর্দিকে উত্থিত সেই উত্তাল তরঙ্গের মাঝখানে প্রেসিডেণ্ট উইলসন একক দণ্ডায়মান। তাঁর স্থির বিশ্বাস, তিনি ঠিক পথ ধরেই চলেছেন এবং তিনি যা বলছেন তা অধিক সংখ্যক লোকেরই ইচ্ছার প্রতিধ্বনি। কিন্তু যে কথাটা তাঁর কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট, তা অপরকে বোঝানো তাঁর পক্ষে এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রেসিডেণ্টের বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি বলতে হয়তো কেউ নেই। লিঙ্কন সম্বন্ধে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি যে নিঃসঙ্গতার বর্ণনা দেন, তা যে এখন তাঁর বুকে চেপে বসেছে গুরুভার শিলাখণ্ডের মত, সে কথা দিনে দিনে তাঁর পরিজনবর্গের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিছুটা বাস্তব এবং কিছুটা ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে তিনি বলেন ঃ

আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক প্রিন্স হলের মত। যখন তিনি পঞ্চম হেন্‌রী হন, তখন ফল ষ্টাফ্ ও অন্যান্য বিদূষকদের জন্য তাঁর আন্তরিক টানে যদিও ভাটা পড়েনি, তবু তাদের রঙ্গ-রসিকতা উপভোগ করবার সামর্থ্য তাঁর আর ছিল না। তখন তিনি গ্রহণ করে বসেছেন এক নূতন ও গুরুগম্ভীর ভূমিকা এবং সে ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প ছিলেন।

মার্কিন নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতে তিনি অবশ্য ইচ্ছুক, কিন্তু তাই বলে বিনম্র মস্তকে বশ্যতা বহন করা উড্রো উইলসনের স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ। লুসিটানিয়া জাহাজ ডুবির ঘটনাকে উপলক্ষ করে জার্মানীর কাছে তিনি যে পত্র প্রেরণ করেন তার সুর ছিল এমন উগ্র যে, স্বভাবতঃ শান্তিবাদী ব্রাঁয়া যুদ্ধের অপরিহার্যতার অনুকূলে অভিমত পোষণ করার পরিবর্তে সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের পদে ইস্তফা দিয়ে বসলেন।

১৯১৫ সালে কর্ণেল হাউস আবার ইউরোপে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য, সেখানে যা ঘটছে কাছ থেকে তার গতি ও প্রকৃতি নিরীক্ষণ করবেন এবং যুদ্ধমান জাতিসমূহ সম্বন্ধে আমেরিকার মনোভাব ব্যক্ত করবেন যথাসাধ্য

স্পষ্টভাবে। যে সব জার্মান-আমেরিকান আমেরিকায় ছিলেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। তাঁরা এই বলে ভয় দেখাতে লাগলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি তার নিরপেক্ষ নীতি থেকে চুল পরিমাণও সরে দাঁড়ায়, তাহলে তাঁরা চেষ্টা করবেন আইরিশদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটাতে। হাউস ইংলণ্ডে গিয়ে লর্ড গ্রের সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কোন্ কল্যাণ সাধিত হবে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের ফলে? জবাবে লর্ড গ্রে বলেন, এর ফলে যে শান্তি স্থাপিত হবে তা কোন দিনই ভঙ্গ হবে না। প্রেসিডেন্ট উইলসনের মতামত নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। হাউস বলেন, যুদ্ধ অপেক্ষা ভবিষ্যতের শান্তির গুরুত্ব প্রেসিডেন্ট উইলসনের কাছে সমধিক। আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকতে চায় এই কারণে যে, সময় সমাগত হলে সে যাতে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

ইউরোপীয় কূটনীতিকদের মধ্যে গ্রেই সর্বপ্রথম এই অবস্থার যৌক্তিকতা মেনে নেন, শুধু তাই নয়, তাকে সাদরে সম্বর্দ্ধিতও করেন। তিনি একথা ভাল ভাবেই জানতেন যে, বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ যখন আসবে, তখন শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে নিঃস্বার্থ এবং নিরপেক্ষভাবে সাহায্য যদি কেউ করতে পারে, তবে তা পারবে আমেরিকা।

কথাটা দেশের লোককে বুঝিয়ে বলা উইলসনের পক্ষে কিন্তু তেমন সহজ হল না। অক্টোবর মাসে আমেরিকান বিপ্লবের আত্মজাদের কাছে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি আর একবার বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলেন। তিনি বললেন, “আমরা বিপদ এড়াবার চেষ্টা করছি না। আমরা চেষ্টা করছি সেই ভিত্তিমূল অটুট রাখতে—শান্তির সৌধ যার উপরে গঠিত হবে”।

একমাস পরে নিউইয়র্কের মানহাট্টান ক্লাবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে দেশীয় রক্ষা-ব্যবস্থার নীতির সমর্থনের উপর তিনি জোর দেন সর্বপ্রথম। তিনি যা বলেন তার মধ্যে নাটকীয় কোন ভঙ্গী ছিল না। কর্মজীবনের প্রতিটি সঙ্কিক্ষণে যখনই শ্রোতাদের সম্মুখে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় তাঁকে উপস্থাপিত করতে হয়েছে, তখনই তিনি যেমন ভাবাবেগ বর্জন করে জোর দিয়েছেন বাস্তব ঘটনার উপরে, এক্ষেত্রেও তিনি ঠিক তাই করলেন। পূর্বাঞ্চল সাদর সম্বর্দ্ধনা জানালো তাঁর উক্তির উদ্দেশ্যে। তারা আশ্বস্ত হল এই কথা ভেবে

যে, ইউরোপ কর্তৃক যদি অতর্কিতে আক্রান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে আমেরিকা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকবে না। কিন্তু এ ঘোষণা মিসিসিপির পশ্চিমপারে সন্তোষের সাড়া জাগাতে পারল না। যুক্তরাষ্ট্র অন্ততঃ নিরাপদ। যুদ্ধক্ষেত্রের সীমারেখা থেকে কতো হাজার মাইল দূরে সে অবস্থিত!

এই তীব্র মতভেদ সম্মিলিত-কর্মপন্থা গ্রহণের পথে হয়ে দাঁড়ালো অন্তরায় স্বরূপ। প্রেসিডেন্ট যাত্রা করলেন মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার পথে:

"আমার দেশবাসীকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলতে চাই যে, এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার ফলে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন দেখা দিয়েছে দেশকে প্রস্তুত করে তোলার। সে প্রস্তুতি যুদ্ধের জন্য নয়, দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য।

১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে নিউইয়র্কে প্রদত্ত ভাষণ প্রসঙ্গে উইলসন খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেন যে, তাঁর মত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেন:

আপনারা যখন আগেই শুনলেন যে, প্রস্তুতি সম্বন্ধে আমি আপনাদের কাছে কিছু বলতে আসছি, তখন বছর খানেক আগে কংগ্রেসের সম্মুখে আমার প্রদত্ত ভাষণের কথা নিশ্চয় আপনাদের স্মরণে জেগেছিল। সে ভাষণে আমি এই কথাই বলেছিলাম যে, সামরিক প্রস্তুতি তেমন জরুরী কোন প্রশ্ন নয়। তারপর এক বছরের কিছু বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং এই চোদ্দ মাস সময়ের মধ্যে যদি কিছু শিক্ষালাভ আমি না করে থাকি, সে আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। বিশ্বপরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যে মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে না পারবে, সেই দণ্ডে আমি নিক্ষিপ্ত হব অতীতের আবর্জনা স্তূপে।"

পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শন কালে নিজের অসুবিধার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, আপনারা আমার উপর দু-দুটো দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন; একদিকে বলছেন, দেখবেন মিঃ প্রেসিডেন্ট, যুদ্ধে যেন আমাদের জড়িয়ে পড়তে না হয়। আবার অন্যদিকে একথাও বলছেন যে, জাতীয় মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। একটি বস্তু আছে যার বিনিময়ে শান্তি ক্রয় করা চলে না। সে বস্তুটি হল আত্মসম্মান। এক কথায় বলতে গেলে, আত্মমর্যাদার মূল্যে শান্তি ক্রয়-যোগ্য নয়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, এ কথা সত্য যে, কোন

এক জাতি কখনও অন্য কোন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি। যুদ্ধ হয় এক গভর্ণমেণ্টের অন্য আর এক গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে।

জনসাধারণের চিন্তা সব সময়েই উইলসনের মনকে আচ্ছন্ন করে থাকত। কেবলমাত্র এদেশের নয়, পরন্তু সকল দেশেরই সাধারণ লোক যে শান্তিপ্রিয় এ ধারণা ছিল তাঁর মনে বদ্ধমূল। তাঁর বক্তব্য এই যে যতক্ষণ না এ কথা সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, একটা গোটা জাত সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে যুদ্ধের সমর্থনে, আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট ততক্ষণ তাঁদের নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলবেন। গণতন্ত্র বলতে সেই রাষ্ট্রকেই বোঝায় জনসাধারণ যে রাষ্ট্রের শাসক। স্বৈরতন্ত্র যে কাকে বলে সে কথা সম্যকরূপে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কর্ণেল হাউস এবং কাইজারের মধ্যে সাক্ষাৎকারকালে। উইলহেল্‌ম কাইজার তখন বলেন, 'সময় যখন আসবে তখন আমি এবং আমার খুড়তুতো ভাই জর্জ ও নিকোলাস শান্তির কথা বলবো।" স্পষ্টই বোঝা যায়, এই সব সূক্ষ্মতর ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জাতি অথবা জাতীয় জনসাধারণের কিছুই করবার নাই। তাদের সর্বজ্ঞ শাসক সম্প্রদায়ই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং বিজয়লব্ধ বিত্ত ভাগ বাটোয়ারা করে নেবেন নিজেদের মধ্যে।

মার্চ মাসে জার্মান ডুবো-জাহাজের আক্রমণে সাসেক্স নামে আর একখানি অতিকায় অর্ণবপোত নিমজ্জিত হল, তার ফলে, মার্কিন জনমতের অন্তর্নিহিত পার্থক্য হয়ে উঠলো আরও উচ্চতর।

পূর্ব-আমেরিকা আবার প্রশ্ন তুললো, "প্রেসিডেণ্ট এখন কি করবেন? এই অপমান আর কতদিন আমাদের সহ্য করতে হবে?"

পশ্চিম আমেরিকার জনমত উচ্চকণ্ঠে জানালো, "যুদ্ধ নয়"! প্রেসিডেণ্ট উইলসন এক পত্রের মাধ্যমে জার্মানীর নিকট এই মর্মে এক কঠোরতর সতর্কবাণী জানিয়ে পাঠালেন যে, ডুবো-জাহাজী যুদ্ধের এই নৃশংস কার্যকলাপ সংযত করে যদি তাকে মানবিকতার সীমার মধ্যে আনা না হয়, যুক্তরাষ্ট্র তা হলে উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হবেন। তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন শান্তির জন্য, এমন একটা স্থায়ী শান্তির জন্য স্বৈরাচারী শাসক সম্প্রদায় যার রচয়িতা হবে না, পরন্তু যার পক্ষে থাকবে জনসাধারণের সম্মতি ও সমর্থন।

যে নীতি বলে যুক্তরাষ্ট্র একটা সঙ্ঘবদ্ধ জাতি রূপে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্যান-আমেরিকান লীগ গঠনের ইঙ্গিত। লীগ অব্ নেশ্যান্স বা জাতিসঙ্ঘ গঠনের ক্ষেত্রেও কি সেই একই আদর্শের প্রয়োগ সম্ভব নয়? শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত লীগের এক সভায় ২৭শে মে তারিখে উইলসন সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন, "আমরা চাই অথবা না চাই, বিশ্বজনের জীবনপ্রবাহের সঙ্গে আমাদের জীবন ধারা যুক্ত।" যে বিচ্ছিন্নতা এতদিন রাজনৈতিক আকাশের উজ্জ্বল তারকা রূপে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতিকে পথ দেখিয়ে এসেছে, মনে হল, সে ঐতিহাসিক-তাৎপর্যে সে বুঝি আর বজায় রাখতে পারছে না। উইলসন ঘোষণা করলেন:

জাতিসমূহের সাধারণ স্বার্থ-ঘটিত মূলনীতি যখন নির্ধারিত হবে এবং কোন এক বা একাধিক জাতির আক্রমণে সে নীতি বিপর্যস্ত হতে বসলো আর সব জাতি যখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করবার জন্য প্রস্তুত হবে, কেবলমাত্র তখনই বোঝা যাবে যে, সভ্যতা অবশেষে তার অস্তিত্ব সপ্রমাণ করতে উদ্যত হয়েছে এবং অগ্রসর হয়েছে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভের পথে। ব্যষ্টির ক্ষেত্রে আমরা মর্যাদার যে মহান নীতি মেনে চলি, স্পষ্টই দেখা যায় যে, সমষ্টির ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে জাতিসমূহকে সেই নীতির অনুশাসনই মেনে চলতে হবে।

প্রেসিডেন্টের ভাষণে তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়:

(১) প্রতিটি জাতির আপন আপন পছন্দমত শাসন ব্যবস্থা বেছে নেবার অধিকার থাকবে; (২) বড় বড় দেশগুলি যে সার্বভৌম অধিকার ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা ভোগ করবার জন্য আশা ও দাবি রাখে, ছোট ছোট রাজ্যগুলিরও তা ভোগ করবার অধিকার থাকবে; (৩) বিভিন্ন জাতির অধিকারের অস্বীকৃতি ও আক্রমণাত্মক কর্মতৎপরতা থেকে যে সব উপদ্রবের সৃষ্টি তা হতে নিজেকে মুক্ত থাকবার অধিকার পৃথিবীর থাকবে।

এই সব ব্যাপারে আমেরিকার ভূমিকা হবে:

এ কথা আমি অগ্রিম জানিয়ে রাখতে চাই এবং আমেরিকার জনসাধারণের সম্মতি ও সমর্থন ক্রমেই জানিয়ে রাখতে চাই যে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি সাধনের ও নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্ত জাতিসমূহের সমবায়ে যে কোন প্রকারের সঙ্ঘই গঠিত হোক না কেন, আমেরিকা তার অংশীদার হবার জন্য ইচ্ছুক।

১৯০১ সালে উইলসন লিখেছিলেন যে, আমেরিকার এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার অবসান অত্যাবশ্যক। যে কোন রাজনৈতিক মতবাদই এর বিরোধিতা করুক না কেন, বিশ্বের ব্যাপারে আমেরিকার অংশ গ্রহণ অনিবার্য। মার্কিনী বিচ্ছিন্নতার এই নীতি গড়ে ওঠে জর্জওয়াশিংটনের বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণের উপর ভিত্তি করে। ঠিক এই সময়েই সে নীতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের নূতন ব্যাখ্যা তিনি দান করেন। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন সম্ভবতঃ এই কথাই আমাদের বলতে চেয়েছিলেন, "যতদিন না সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে বাইরের দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়বার মত বড় হয়ে ওঠো, যতদিন না অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার যোগ্যতা অর্জন কর, আমি চাই, ততদিন তোমরা শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক হয়ে থাক, নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে এনে নিজেদের তৈরী করে তোল।"

প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর প্রথম বারের কার্যকালে ইউরোপ যখন বিশ্ব-যুদ্ধের প্রকোপে পড়ে বিধ্বস্ত হচ্ছিল, এমন কি, তখন পর্যন্ত যত প্রকারে সম্ভব তিনি যদিও বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, অন্যান্য জাতি সম্পর্কে আমেরিকার এই মামুলী মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন, তথাপি নিরপেক্ষতার নীতি হতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ছিল এই যে, যে যুদ্ধের হেতু ও উদ্দেশ্য আপাততঃ এমন জটিল এবং অস্পষ্ট, সে যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে জড়িত না হয়ে, শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হওয়াই আমেরিকার ব্রত হওয়া উচিত। জেফারসনের যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে উইলসনের চিন্তা ও কর্মপন্থা গড়ে উঠে, তিনি চেষ্টিত হলেন তাকে তার চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে। তিনি বললেন:

টমাস জেফারসনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদনের একটি মাত্র উপায় আছে এবং তা হল, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা, তাঁর আদর্শকে রূপ দান করা। তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রেখে গেছেন তা হল, মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য সংগঠনের মাধ্যমে ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তৎপর হওয়া। সে কাজ যদি আমেরিকায় আমরা সাধন করতে পারি, তা হলে আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁর সাধন করা সম্ভব হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথা সমগ্র বিশ্বের মন বিদ্বেষ ও রক্তপাত, বিজাতীয় ঘৃণা ও হিংসার দ্বারা সমাচ্ছন্ন, এরই মধ্যে উইলসন একাকী নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন শান্তি ও জাতিসমূহের মধ্যে মৌলিক সম্পর্ক স্থাপনের স্বপ্নের মধ্যে। যেমন করেই হোক, আমেরিকাকে তাঁর বক্তব্য শুনতেই হবে এবং শোনবার পর তটস্থ হয়ে চিন্তা করতে হবে। অন্য আর এক ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যদি কেউ চুপ করে নিজের আসনে বসে তোমার কথা শুনতে না চায়, তার ঘাড়ের উপর চেপে বসে সে কথা তাকে শুনতে বাধ্য কর। আমেরিকা শেষ পর্যন্ত তাঁর কথা শুনলো।

১৯১৬ সালের ১৫ই জুন তারিখে ডেমোক্রাটিক দলের জাতীয় সম্মেলন যখন অধিবেশন রত হয়, তখন এ সম্বন্ধে কারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র রইলো না যে, যুদ্ধ সম্বন্ধে মাকিন জনসাধারণের মনোভাব তিনি ধরতে পেরেছেন সঠিক ভাবে। সেই জন্যই বিপুল সম্বর্ধনা সহকারে তিনি দ্বিতীয়বার মনোনয়ন লাভ করলেন। সিনেটার ওলী জেম্‌সের ভাষণের মধ্যে এই ব্যাপার সংক্রান্ত মূল সুরটি বেজে উঠে :

একটিও আমেরিকান শিশুকে পিতৃহীন না করে, আমেরিকার কোন একটি জননীকেও বৈধব্য দশা দান না করে, একটিও কামান না দেগে এবং এক বিন্দুও রক্তপাত না করে অভূতপূর্ব যুদ্ধোন্মাদনায় উন্মত্ত-জাতিসমূহের কাছ থেকে আমেরিকার দাবি ও অধিকারের অনুকূলে তিনি স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন।

উইলসনের পররাষ্ট্র নীতির স্বপক্ষে সরকারী সমর্থন বলতে গেলে এই সর্বপ্রথম। যুদ্ধমান জাতিসমূহের কাছে প্রেসিডেন্ট তীব্র মন্তব্য সম্বলিত যে সব দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেছেন, এই সমর্থনই তজ্জাত সর্বপ্রথম ফল। সপ্রশংস এই সমর্থন সেণ্ট লুইতে যে বিপুল সাড়া জাগায় তার মধ্যে এমন একটা সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল যা স্মরণ করিয়ে দেয় এরূপ আর একটি লোকের কথা— আমেরিকার ইতিহাসে যার নাম অনপনেয় অক্ষরে মুদ্রিত হয়ে থাকবে।

"আমার দৃষ্টিতে উইলিয়াম পেন্ আধ্যাত্মিকতার পথে যেন এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, জলন্ত বর্তিকা তিনি স্বহস্তে বহন করে চলেছেন যাতে করে পিছনে যারা আসছে তাদের সম্মুখে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের পথ আলোক দীপ্ত হয়ে উঠে।"

১৯১৬ সালে প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য প্রচারকার্য পরিচালনার সময়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন—প্রথম কার্যকালে তিনি যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তারই বিশদ আলোচনার মধ্যে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, প্রগতিবাদের প্রাঙ্গণই হবে আমাদের নিজস্ব মঞ্চ। তিনি ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সে প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছে। "তিনি আমাদের যুদ্ধ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন"—এই স্লোগান ডেমোক্রাটিক পার্টির হাতে, বিশেষ করে, পশ্চিম-আমেরিকার ডেমোক্রাটিক পার্টির হাতে একটা মস্তবড় মূলধন হয়ে উঠে। রিপাব্লিকানরা কিন্তু পড়ে গেল উভয় সঙ্কটে। গত দু-বছর ধরে যুদ্ধ-সংক্রান্ত মনোভাবের জন্য তাঁরা উইলসনকে তিরস্কার করে এসেছেন। তাঁরা বরাবর জোর দিয়ে এ-কথা বলে এসেছেন যে, ইউরোপের যুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য। তাঁদের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে, জাতির আত্মমর্যাদাবোধ ও বিচারবুদ্ধি ক্ষুণ্ণ না করে সরকারের রচিত নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলা অসম্ভব।

এখন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, তাঁদের এই অভিমতের মধ্যে জনমতের প্রতিফলন ছিল না। জনসাধারণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। ইউরোপীয় যুদ্ধে আমেরিকার সশস্ত্র হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি ছাড়া সমগ্র আমেরিকার কাছে অবাঞ্ছনীয় প্রস্তাব।

নির্বাচনী ফলাফল ধীর মন্থর গতিতে এসে পৌছাতে লাগলো। প্রথমেই গণনা করা হল পূর্বাঞ্চলের ভোট এবং গণনা শেষে দেখা গেল, রিপাব্লিকান প্রার্থী চার্লস ই. হিউজেস্ অনেক ভোটে এগিয়ে আছেন। উইলসন ধরে নিলেন যে, তাঁর পরাজয় অনিবার্য। তথাপি তাঁর দৃষ্টি কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। তিনি ভাবলেন, পরাজিত যদি তাঁকে হতেই হয়, সে ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রেসিডেণ্টের অভিষেক কাল পর্যন্ত দেশ নিক্ষিপ্ত থাকবে অনিশ্চয়তার এক বিপুল আলোড়নের আবর্তে। সে সম্ভাবনার পথ রোধ করবার উদ্দেশ্যে তিনি এমন এক কর্মপন্থা রচনা করে রাখলেন যার বলে হিউজেস্ সঙ্গে সঙ্গে কার্যভার গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু সে পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত কোন কাজে এলো না। সব ভোট গণনা শেষ হলে দেখা গেল, উইলসন পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনের পরে ডেমোক্রাটিক দলীয় প্রেসিডেণ্টরূপে উইলসনই হলেন তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী।

জনসাধারণের মন আবার মুখ ফেরালো ইউরোপের দিকে। অবস্থা দিনে দিনে আরও নৈরাশ্য ব্যঞ্জক হয়ে উঠছিল। আমেরিকা এক্ষেত্রে কি করবে? মানব-সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, আর উইলসন কি নিশ্চেষ্টভাবে বসে বসে তাই দেখবেন? চূড়ান্ত আঘাত নেমে এ'ল ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে। যুদ্ধমান জাতিসমূহের প্রত্যেকের কাছে তিনি জানতে চাইলেন, যুদ্ধের হেতুটা কি? প্রশ্নের জবাবও অবশ্য এলো—এবং তা হতে দেখা গেল যে, মিত্রপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের মধ্যে যুদ্ধের উদ্দেশ্যগত পার্থক্য বিদ্যমান অনেকখানি। আমেরিকাকে যদি সত্য সত্যই শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিতেই হয়, তা হলে আমেরিকা কোন্ পক্ষ নেবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই রইল না।

১৯১৭ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত এক ভাষণে উইলসন প্রস্তাব করলেন যে, প্রেসিডেণ্ট মন্‌রোর নীতিকেই বিভিন্ন জাতিসমূহের বিশ্ব-নীতি-রূপে মেনে নেওয়া উচিত। তিনি একথাও ঘোষণা করলেন যে, 'বিজয়-বিহীন-শান্তিই' ইউরোপীয় যুদ্ধের চূড়ান্ত ও বাঞ্ছিত পরিণতি হওয়া বিধেয়।

কিন্তু 'বিজয়-বিহীন-শান্তি' বলতে যে বস্তুটিকে বোঝায় তার যথার্থ কারও বোধগম্য হল না; কাজেই তার উদ্দেশ্যে সম্বর্ধনাও বিজ্ঞাপিত হল না কোন অঞ্চল থেকে। কি পূর্বের, কি পশ্চিমের—দুই অঞ্চলের রাজ্যগুলিই জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় কামনা করছিল। ৩১শে জানুয়ারী তারিখে জার্মানী যে দিন ঘোষণা করলো যে, ডুবো-জাহাজী যুদ্ধ পরিচালনের ক্ষেত্রে কোন নীতি বা নিয়মের অনুশাসন সে মানবে না, এই মনোভাব উগ্রতর আকারে আত্ম-প্রকাশ করলো সেইদিন। উইলসন জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন তিনদিনের মধ্যে। চতুর্থ দিনে জার্মান রাষ্ট্রদূত কাউণ্টভন্ বার্ণষ্টর্ফ যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে স্বদেশ যাত্রা করলেন। এর পরেই ওয়াশিংটনের উপরে নেমে এলো এক নিঃশব্দ নীরবতা। দেশব্যাপী প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর উঠলো আরও উচ্চতর পর্দায়। যুদ্ধোন্মাদনা অবশেষে পেয়ে বসলো সমগ্র জাতিকে।

অভিষেক দিবসে উইলসন তাঁর নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন:

সশস্ত্র নিরপেক্ষতার নীতিতে আমরা অবিচল। আমরা কি চাই এবং কোন্ বস্তুটি, আমরা কোনও মূল্যেই বিনিময় করতে প্রস্তুত নই, আমার মনে হয়, সে কথা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেবার এ'ছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নাই।

সাত

যুদ্ধকালীন প্রেসিডেণ্ট

একজন দূত হোয়াইটহাউস থেকে যাত্রা করলো ক্যাপিটলহিলে অবস্থিত সেই ভবনের পথে যার বিরাট গম্বুজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ওয়াশিংটনের আকাশে। সে চলেছে প্রেসিডেণ্টের একটি বিশেষ বার্তা বহন করে। কংগ্রেসের উভয় হাউসের যুক্ত অধিবেশনে তিনি ভাষণ দান করবেন।

তিনি কি বলবেন এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা স্বরু হয়ে গেল। সেদিন ছিল ১৯১৭ সালের ২রা এপ্রিল। হোয়াইটহাউসের এই ব্যক্তিটি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে নিরপেক্ষতার নীতির কথাই আর একবার জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছিলেন। তারপর দু'মাস কাল অতিবাহিত হয়ে গেছে, অথচ এই সময়ের মধ্যে এ সম্বন্ধে আর কোন সাড়া-শব্দ জাগে নি। সেই নীতি সংশোধনের কথা জ্ঞাপন করবার জন্তই কি তিনি কংগ্রেসে ভাষণ দিতে আসছেন? জার্মানীর নৃশংস ডুবো-জাহাজী যুদ্ধের বিরুদ্ধে অ্যাটলাণ্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আমেরিকা জুড়ে যে দারুণ বিক্ষোভ জেগে উঠেছে, আমেরিকার সঙ্ঘবদ্ধ জনমতের তা অবিকল প্রতিধ্বনি, এরূপ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা আর কদাচ সম্ভব নয়।

প্রতিনিধি পরিষদের সভাগৃহ কংগ্রেস ও সিনেটের সদস্যদের ভীড়ে ভরে উঠল। গ্যালারীগুলিতে যে রকম জনসমাগম হল আমেরিকার ইতিহাসে তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সে ভীড়ের মধ্যে ছিলেন সরকারী পোষাক-পরিহিত বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ, কৃষ্ণবর্ণ পরিধেয়ে সজ্জিত সুপ্রিমকোর্টের বিচারকবৃন্দ, দেশের প্রখ্যাতনামা সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদক ও নিজস্ব সংবাদদাতাগণ, স্থল ও নৌবাহিনীর সামরিক কর্মচারীরা যে সোণালী রং-এর পোষাকে ভূষিত হয়ে এসেছেন তার বর্ণছটা ছড়িয়ে পড়ছে অপেক্ষমান জনতার উৎকণ্ঠিত চোখে-মুখে। গণতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রে বর্ণসমারোহে সমুজ্জল এমন নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা অত্যন্ত বিরল।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো। দীর্ঘাকৃতি ও কৃশতনু একব্যক্তি এসে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপরে। বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক সে চেহারার দিকে চাইলেই মনে হয়, সঙ্কট-সঙ্কুল সমস্যা সমূহের সমাধান প্রচেষ্টায় অর্ধরাত্রি অতিবাহিত করাই যেন তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। সভার উপর দিয়ে বয়ে গেল স্বাগত সম্বর্ধনার একটা মৃদু মর্মর ধ্বনি। স্পীকার সজোরে হাতুড়ি ঠুকে ঘোষণা করলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের আগমন বার্তা।

তারপর যে নীরবতা নেমে এলো, তারই মধ্যে উড্রো উইলসন পড়তে আরম্ভ করলেন তাঁর লিখিত ভাষণ, তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর কখনও বা উচ্চ-গ্রামে উঠে চলেছে, কখনও বা নেমে আসছে নীচের পর্দায় :

আমি কংগ্রেসের এক যুক্ত ও জরুরী অধিবেশন আহ্বান করেছি এই কারণে যে, এক গুরুতর নীতি-নির্বাচন সমস্যার আমরা সম্মুখীন এবং সে নির্বাচন কার্য আমাদের সম্পন্ন করতে হবে এখনই এই মুহূর্তে।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কোন ঘটনা যে আসন্নপ্রায় সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোন অবকাশই রইল না। নিরপেক্ষতা এবং তৎসহ তার যত কিছু অচিন্তনীয় তাৎপর্য-বর্জিত হতে চলেছে। আমেরিকার স্বাধীনতাকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার সময় সমাগত, বিশ্ব-ইতিহাসের ধারার গতি পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করবার জন্য দর্শকবৃন্দ সেই বিরাট হলঘরে বসে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছিলেন। প্রেসিডেণ্ট তাঁর ভাষণ পড়ে চললেন :

এমন একটি পথ আছে যা আমরা বেছে নিতে পারি না—বেছে নিতে আমরা অসমর্থ, সে পথ আত্মসমর্পনের, সে পথ, জাতির পবিত্রতম

অধিকারকে লাঞ্ছিত ও পদদলিত হতে দেবার। আজ যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়াতে চলেছি তা সচরাচর অনুষ্ঠিত কোন সাধারণ অন্যায় নয়। সে অন্যায় মানুষের জীবনের ভিত্তিমূলে আঘাত করে…

তার অর্থ যুদ্ধ! হ্যাঁ যুদ্ধই। শর্তহীন এমন এক সংগ্রামের ঘোষণা —যাতে সমগ্র জাতি অস্ত্র ধারণ করতে বাধ্য হবে।

জার্মান সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট যে সব ক্রিয়া-কলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন তা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়, আমার পরামর্শ হল, কংগ্রেস সে কথা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করুন। কংগ্রেস ঘোষণা করুন যে, যুদ্ধে লিপ্ত হবার যে দায়িত্ব ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আমরা গ্রহণ করলাম। কেবলমাত্র দেশের রক্ষা ব্যবস্থাই দৃঢ়তর করে তুললে চলবে না, পরন্তু অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক যার বলে জাতির সমস্ত শক্তি সংহত করে জার্মান গভর্ণমেণ্টকে আপোষ রফায় আসতে বাধ্য করা সম্ভব হবে, সম্ভব হবে যুদ্ধের গতি পথের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া। জার্মান জাতির সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নাই, তাদের প্রতি সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি ছাড়া অন্য কোন রূপ মনোভাব আমরা পোষণ করি না। জনসাধারণের ইচ্ছাক্রমে অথবা তাদের অগ্রিম সম্মতি নিয়ে গভর্ণমেণ্ট এ যুদ্ধে নামেন নি।…

স্থায়ী শান্তির ঐক্যতান-মঞ্চ গড়ে তোলা কখনই সম্ভব হবে না—যদি না গণতান্ত্রিক জাতিগুলি সহযোগী রূপে সে গঠন কার্যের অংশীদায়িত্ব গ্রহণ করে। স্বৈরতন্ত্রী কোন সরকার বিশ্বাস ভঙ্গ অথবা সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করবেন না এরূপ আশা করা অর্থহীন। সে সঙ্ঘ গড়ে উঠবে মর্যাদার ভিত্তির উপরে মতৈক্যের উপরে হবে সে অংশীদায়িত্বের প্রতিষ্ঠা।…

গণতন্ত্রের পক্ষে নিরাপদ করে তুলতে হবে পৃথিবীকে, শান্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিচিত ভিত্তির উপরে।…

সাধন করবার মতো আমাদের নিজস্ব কোন স্বার্থ নেই। আমরা বিজয় চাই না, রাজ্য জয় আমাদের কাম্য নয়। আমরা স্বেচ্ছায় যে স্বার্থত্যাগ করবো, তার জন্য কোন রকম ক্ষতিপূরণ আমরা দাবি করতে চাই না। বিশ্বমানবতার স্বার্থের যাঁরা সমর্থক আমরা তাঁদেরই অন্যতম। জাতি সমূহের

আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনতা-বোধের পক্ষে মানবিক সে অধিকারকে যতটুকু নিরাপত্তা দান করা সম্ভব তা যদি তারা করে তা হলেই আমরা খুসি হব।...

কিন্তু শান্তির চেয়ে স্বাধিকার ঢের বেশী মূল্যবান। গণতন্ত্র, শাসনব্যবস্থা পরিচালন ব্যাপারে জনসাধারণের সম্মতি ও সহযোগিতা, দুর্বল দেশগুলির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার, স্বাধীন জাতি সমূহের সমবায়ে মানবিক অধিকারের এমন এক বিশ্বব্যাপী অঞ্চল গড়ে তোলা যার ফলে সকল জাতির স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং পরিশেষে সাধিত হবে সমগ্র বিশ্বের মুক্তি— এইগুলিই আমাদের কাছে সব চেয়ে প্রিয় ও প্রিয়তম বস্তু, আর আমরা যুদ্ধ করবো এই দুর্লভ বস্তুগুলি লাভের জন্যই।

আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের জীবন, আমাদের যথা সর্বস্ব আমরা উৎসর্গ করতে পারি এই ব্রতের বেদীমূলে এবং তা পারি এই গর্ব নিয়ে যে, যে-নীতি হতে আমেরিকা জন্ম নিয়েছে তার সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি যে-নীতির ফল, তার জন্য রক্ত দেবার, সর্বশক্তি নিয়োজিত করবার সুবর্ণ সুযোগ সমুপস্থিত।

ভগবান যদি সহায় হন, সে এ কাজ করবে, কারণ, এ ছাড়া অন্য কিছু তার করণীয় নেই।...

আমেরিকার জনসাধারণ অবশেষে বিশ্ব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে, নিরপেক্ষ রূপে নয়, দর্শক রূপে নয়, যুদ্ধমান জাতি সমূহের কোন না কোন একটির নিকট পত্র প্রেরণ করবার জন্যও নয়, পরন্তু এক মহান আদর্শের পূজারী রূপে, বিশ্বে গণতন্ত্রের নিরাপত্তা বিধায়ক রূপে।—

কংগ্রেস জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ৬ই এপ্রিল তারিখে। আমেরিকা যুদ্ধে যে কোন বড় রকমের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে এমন আশা অবশ্য অনেকেই করে নি। তা না করলেও এ দেশ নিঃসন্দেহ হয়ে উঠবে সমরোপকরণের বিপুল ভাণ্ডার এবং মিত্রপক্ষ এখান থেকে মুক্ত হস্তের সরবরাহ পাবেন প্রয়োজনীয় অর্থের ও রণ-সম্ভারের।

উইলসন কিন্তু এ মত পোষণ করেন নি। তিনি যখন যুদ্ধের কথা বলেন, তখন তিনি সত্যকার সেই যুদ্ধের কথাই বলতে চেয়েছিলেন যাতে সৈন্য সংগৃহীত হবে, সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটবে এবং সংগ্রাম সুলভ যত কিছু বীরত্ব ও

বিভীষিকা থাকবে যার মধ্যে। এক অক্লান্ত ও অকরুণ কর্মোন্মাদনা তাঁকে পেয়ে বসেছিল এবং তারই তাড়নায় অধীর হয়ে সংগঠন ও পরিকল্পনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ দেশটাকে রূপান্তরীত করতে উদ্যত হলেন এক বিরাট সৈন্য শিবিরে। তাঁর কর্মদক্ষতা ও বেগবত্তা এমন অবিশ্বাস্যরূপে ফলপ্রসূ হল, সংগ্রামের ইতিহাসে যার সমতুল্য দৃষ্টান্ত বিরল।

যুদ্ধ ঘোষিত হবার পরের দিনই তিনি জিদ্ ধরলেন সৈন্য সংগ্রহ সংক্রান্ত বিল প্রণয়ণের জন্য। বয়ঃসীমা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিরোধ ও বিতর্ক দেখা দেওয়ার ফলে ১৮ই মের পূর্বে সে বিল পাশ করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না। যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট অগ্রসর হতে চান, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সেই দিনই তিনি বললেন ; "যুদ্ধের জন্য আমরা যে কেবলমাত্র সৈন্য দলই সংগৃহীত ও সুগঠিত করে তুলবো তা নয়, পরন্তু সমগ্র জাতিকে তৈরী করে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য।"

প্রস্তুতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলবার উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে উইলসন যখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন ভাষণ দান প্রসঙ্গে স্পেন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে রচিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা তিনি আবৃত্তি করেন :

যুদ্ধ অতি অকরুণ অভদ্র ব্যাপার
ওলট-পালট দেশে ঘটে তার ফলে,
যদিও কয়েক হপ্তা পরমায়ু তার
কয়েক বৎসর ধরে আলোচনা চলে।

তাঁর উদ্দেশ্য হল, আলোচনার আয়ুষ্কাল যথাসম্ভব হ্রাস করা।

সেনাবাহিনীই প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং এটা ঠিক যে, কোন সর্তেই সে ইউরোপীয় যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে না। সংখ্যার দিক থেকে সে বাহিনী ছিল ছোটো এবং কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অধীনও তা ছিল না। সামরিক কোন সিদ্ধান্তকে নেমে আসতে হলে প্রায় আধ ডজন খানেক বিভাগের ভেতর দিয়ে তাকে চুঁইয়ে আসতে হোত। সে বিভাগগুলির প্রত্যেকটিই কাজ করতো স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে এবং কখনো কখনো বা পরস্পর বিরোধীভাবে। গৃহযুদ্ধের সময়ে গ্রাণ্ট যতক্ষণ না সেনাবাহিনীর সমূহ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন, ততদিন সে বাহিনী ছিল অক্ষম ও অকর্মণ্য। সে কথা

স্মরণ করে উইলসন এই দ্রুত সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হলেন যে, সেনাবাহিনীকে একক নেতৃত্বের অধীনে আনা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে কাজের জন্য তিনি জেনারেল পার্শিংকে বেছে নিলেন। এই সামরিক কর্মচারিটি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সময়ে ক্যাপ্টেনের পদ থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদে উন্নীত হন। জেনারেল পার্শিং প্রথম সৈন্যদল নিয়ে ফ্রান্সের অভিমুখে যাত্রা করেন ১৯১৭ সালের জুন মাসে।

সামরিক দায়িত্ব একজন অভিজ্ঞ ও কর্মদক্ষ সেনানায়কের হাতে ন্যস্ত, সৈন্যদল যাত্রা করেছে ইউরোপের পথে এবং ড্রাফট প্রথা কার্যতঃ প্রযুক্ত। উইলসন এবার নিশ্চিন্ত হয়ে মনোনিবেশ করলেন অন্য আর এক গুরুতর সমস্যার উপর। সে সমস্যা হল, সমগ্র জাতিকে যুদ্ধের সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য তৈরী করে তোলা। দেশকে যদি ধর্মযুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থাকে কোন না কোন প্রকারের সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনতে হবে, শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাত্রা হ্রাস করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে সংগঠিত করা হল জাতীয় প্রতিরক্ষা-পরিষদ। জাতীয় নিরাপত্তা ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে তার কাজ। নামমাত্র নিয়ন্ত্রণের অধীনে এবং কাজ করবার ব্যাপকতর অধিকার দান করে সামরিক শিল্প-বোর্ড গঠন করা হয় এর পরে।

যুদ্ধকালীন-প্রেসিডেন্টের পক্ষে কাজটা মোটেই সহজসাধ্য হয় নি। জনমতের বিপুল সমর্থন অবশ্য তাঁর পিছনে ছিল। কিন্তু কি কংগ্রেসের ভেতরে কি বাইরে তাঁর রাজনৈতিক শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁর নীতির বিরুদ্ধে আক্রমণ কার্যতঃ আত্মপ্রকাশ করে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে। সে বিরোধিতা যথারীতি গড়ে তোলা হয় ১৯শে জানুয়ারী তারিখে নিউ-ইয়র্কে অনুষ্ঠিত এক ভোজ সভায়। সেখানে যে পরিকল্পনা রচিত হয়, তদনুযায়ী স্থির হয় যে, কংগ্রেস একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করবেন এবং সংগ্রাম পরিচালনের সকল দায়িত্ব প্রেসিডেন্টের অধিকার থেকে হস্তান্তরীত হবে সেই পরিষদের হাতে।

কিছুদিনের জন্য অবস্থা এমন দাঁড়ালো যা দেখে মনে হয়েছিল পরিষদ সংক্রান্ত পরিকল্পনা হয়তো বা কার্যকরী হয়ে যাবে। জনমত স্পষ্টতঃ সোচ্চার

হয়ে উঠলো ঠিক এই সময়ে। অবশেষে উইলসন সিনেটার ওভারম্যানের মাধ্যমে কংগ্রেসের এক বিল আনয়ন করলেন। প্রস্তাবিত সংগ্রাম-পরিষদের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত হবার কথা, উক্ত বিলের বলে সে ক্ষমতা তো প্রেসিডেণ্টের হাতে এলোই এবং তা ছাড়াও এলো আরও অনেক কিছু। ওভারম্যান অ্যাক্ট ২৯শে এপ্রিল তারিখে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় ৬৩-১৩ ভোটে। প্রতিনিধি-পরিষদ তৎপরতার সঙ্গে তার পক্ষে অনুমোদন জানালেন। ফলে, উইলসনের বিরোধী পক্ষের মুখ বন্ধ হয়ে গেল সম্পূর্ণরূপে। তিনি যেভাবে সমর বিভাগের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষরূপে স্বীকৃত হলেন, ইতিপূর্বে আর কোন প্রেসিডেণ্টের পক্ষেই সে স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব হয় নি।

নূতন বিধান স্বৈরতন্ত্রী সুলভ যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলে দিল তাঁর হাতে, তাঁর নিজের ভাষাতে বলতে গেলে, ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

কেবলমাত্র সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুললেই চলবে না, সরবরাহ কৃত দ্রব্য সম্ভারের পরিমাণও পর্যাপ্ত হওয়া যাই। ইউরোপের সবচেয়ে বেশী চাহিদা খাদ্যের, কারণ, যে সব অঞ্চলে যুদ্ধ চলছিল, সেখানে শস্য উৎপাদন আদৌ সম্ভব হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রেও সরবরাহের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছিল। কাজেই, উইলসন হার্বার্ট হুভারকে ডেকে পাঠালেন খাদ্য সমস্যার ভার হাতে নেবার জন্য। মিঃ হুভার কর্ম দক্ষতার গুণে বেলজিয়াম রিলিফে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করবার জন্য আধুনিক প্রচার-যন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠলো। যাতে করে খাদ্যের কিছুমাত্র অপচয় না হয় এবং যত বেশী পরিমাণ সম্ভব খাদ্যদ্রব্য যাতে ইউরোপে প্রেরিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের জন্য রেশন প্রথা প্রবর্তিত হল।

রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপে উইলসন যে সামরিক কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করেন তার অবিকল বিবরণ বিবৃত হয় আঁন্দ্রে তার্দিউ রচিত 'ফ্রান্স এণ্ড আমেরিকা' নামক গ্রন্থে:

যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন চেহারা আমার আজীবন মনে থাকবে। সমগ্র আমেরিকা তখন দেশ প্রেমের প্রেরণায় বেগবান যেন এক বিরাট সমর-যন্ত্র; তার সমগ্র সত্তা তখন উত্তেজনার আগুনে বহ্নিমান; দশকোটি নরনারী ও

ছেলেমেয়ের সমূহ শক্তি ও স্নায়ু-শিরা ঝুঁকে পড়েছে রপ্তানী বন্দরের দিকে, কলের চিমনী সমূহ ধূম্র উদ্গীরণ করছে; রাত্রির ঈষদুষ্ণ বায়ুস্তর ভেদ করে ছুটে চলেছে ট্রেনগুলো; যে সব সৈন্যদল যাত্রা করেছে যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে, ষ্টেসনে ষ্টেসনে মেয়েরা তাদের গরম কফি পরিবেশন করছে, অম্বর চুম্বন করছে জাতীয় সঙ্গীতের সমুখিত সুর, গীর্জায় গীর্জায় চলেছে স্বাধীনতার অনুকূলে ঋণদানের আবেদন-সম্বলিত সভা-সমিতির অনুষ্ঠান, সে সভার অনুষ্ঠান চলেছে প্রতিটি থিয়েটারে ও প্রতিটি পথের বাঁকে, দেয়ালে দেয়ালে বিরাট আকারের প্রাচীরপত্র: 'এ যুদ্ধে তোমরাও জড়িত, জয় তোমাদের অর্জন করতেই হবে।' বিপুল ও অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জিত হল বটে, কিন্তু আমাদের আদর্শের মহানতা ও বিপদ সম্ভাবনার সমূহ ভয়াবহতা থাকা সত্ত্বেও সে সাফল্য অর্জনের জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহও মাসের পর মাস ধরে প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের জন্য, নীতি এবং তার কার্যত: প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন দেখা দিল খাপ খাইয়ে নেবার, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করবার এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করবার। কৃতকার্যতা এনে দিল সঙ্গতি সাধনের ক্ষেত্রে এই সাফল্যই। কাজ অগোছালো ভাবে করা হলে সে কাজ পর্যবসিত হোত পণ্ডশ্রমে।

সময় বয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাও বেড়ে চললো সেই অনুপাতে। সরবরাহের পরিমাণ ও বণ্টনের ব্যবস্থা অবশ্য এক প্রকার স্থিরই হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাকী ছিল পরিবহন সমস্যা। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উইলসন সমরকালীন ব্যবস্থা হিসাবে রেলওয়ে সমূহকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে এলেন। তার ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বী-রেলওয়েগুলির মধ্যে পরিবহন সংক্রান্ত প্রতিযোগিতার অবসান ঘটলো। রেলকর্মী ও অন্যান্য শিল্পের কর্মীদের মধ্যে মালিক ও শ্রমিক ঘটিত কোন গোলযোগ যদি দেখা দেয়ই, তার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা যাতে ব্যাহত না-হয় সেই উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড গঠন করা হল। যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজী-বোর্ড কাজ করে চললো প্রচণ্ড বেগে। জাহাজী কারখানা গড়ে উঠতে লাগলো রাতারাতি। আওয়াজ উঠলো: হয় হপ্তায় তিনখানা জাহাজ তৈরী কর, নয় জাহান্নামে যাও!

উৎপাদনের এ হার অভূতপূর্ব। বছরের পর বছর ধরে উইলসন চেষ্টা করে এসেছেন শান্তি রক্ষার জন্য। সে কারণে তাঁকে বিদ্রূপ করা হয়েছে এমন এক শান্তিবাদী লোক বলে যে সর্বপ্রকারের অপমান সহ্য করবে তবু পুরুষোচিত ভূমিকা অভিনয় করবে না। সেই তিনিই এখন হয়ে উঠলেন যুদ্ধকালীন-প্রেসিডেন্ট বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। চূড়ান্ত অর্থে, তিনি এখন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সেই হিসেবে তাঁকে গ্রহণ বহন করতে হল কঠোরতম শ্রমের দায়িত্ব।

দৈনন্দিন কাজের দুর্বহ চাপ সত্বেও প্রেসিডেন্ট ভাষণ দেবার সময় করে নিতেন। সেই সব ভাষণের অন্তরালে যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকতো, উপর থেকে কারও চোখে তা ধরা পড়তো না। তিনি যা বলতেন তার মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণার চেয়ে শান্তি স্থাপনের আগ্রহই আত্মগোপন করে থাকতো বেশী পরিমাণে। বিজয়-বিহীন-শান্তি, সমানাধিকারের ভিত্তিতে শান্তি—এই ছিল তাঁর আবহমান কালের আদর্শ এবং সে আদর্শ থেকে তিনি এক চুলও বিচ্যুত হন নি। অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত তাঁর কথাগুলির মধ্যে যদিও নাটকীয় কোন ভঙ্গী থাকতো না, তবু তারই সাহায্যে যুদ্ধকে এমন উচ্চ পর্যায়ে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল ইতিপূর্বে আর কোন দিন সে পর্যায়ে পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সংগ্রাম কার্যতঃ রূপ পরিগ্রহ করলো জঙ্গীবাদ বিরোধী ধর্ম-যুদ্ধের। ধীরে ধীরে তিনি জাগিয়ে তুললেন এক নূতন আশার আভাস, মানবিক কার্য-কলাপকে তিনি অনুপ্রাণিত করে তুললেন এক নূতন আদর্শে। কেবলমাত্র জাতীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক রূপেই নয়, পরন্তু উড্রো উইলসন কালক্রমে আবির্ভূত হলেন বিশ্বমানবতার আধ্যাত্মিক নেতা রূপে।

তখন আমেরিকার মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪,২৭২,৫২১ এবং তাদের মধ্যে ১,৯৫০,৫১৩ সৈন্য প্রেরিত হল সাগরপারে। এত বড় একটা বিশাল-বাহিনী তার বিপুল রণ সম্ভার সহ এর আগে আর কোন দিন ৩০০০ মাইল দীর্ঘ সমুদ্র পথ অতিক্রম করে নি। অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা যদিও প্রতিপদে বিদ্যমান, তথাপি সম্পূর্ণ নিরাপদে সে বাহিনী সুদূর প্রসারী সে সমুদ্রপথ পার হয়ে যায়। বিরাট সে দায়িত্বভার উদ্‌যাপিত হয় এমন চমৎকার সাফল্যের সঙ্গে যে, তার গায়ে অসাধুতার অভিযোগ কলঙ্কের মসী-বিন্দু

পর্যন্ত পাত করতে পারে না, যে ব্যাপারের সঙ্গে কোটী কোটী ডলারের আদান প্রদান জড়িত, তার সম্বন্ধে আত্মসাতের অনুমাত্র সন্দেহ জাগে নি কারও মনে। এই সব কৃতকার্যতা যখন অর্জিত হয়ে চলেছে, তখন দেখা গেল যে, জার্মানীর মিত্রপক্ষের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক বজায় রেখে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অর্থহীন। কাজেই ১৯১৭ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধেও যথারীতি যুদ্ধ ঘোষণা করল।

এদিকে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনায় ও কাল্পনিক কাহিনীতে আমেরিকার আকাশ-বাতাস যখন সরগরম, উইলসন তখনও কিন্তু প্রচার করে চলেছেন শান্তি ও গণতন্ত্রের বার্তা, বিশ্বের বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি। পোপ ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধমান জাতি সমূহকে সম্বোধন করে শান্তির শর্ত-সম্বলিত ভাষণ দান করেন। উইলসন মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে মিত্রপক্ষ জার্মান জাতির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে প্রস্তুত, কিন্তু জার্মান গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে নয়। ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এই কথারই পুনরুক্তি করেন। তাঁর আদর্শ সম্বলিত সেই ভাষণের অনুলিপি বিমানের সাহায্যে শত্রুর রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হল এবং সেগুলি পৌছালো তাদেরই হাতে—যাদের লক্ষ্য করে এগুলি নিক্ষিপ্ত হয়। অনেকের বিচারেই সাব্যস্ত হল যে, এ একটা রণকৌশল বটে, কিন্তু কৌশল হিসেবে এ যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি শ্লথ-গতি। সে যাই হোক, বক্তৃতাগুলি যে জলন্ত অনলবর্ষী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। যাদের হাতে সেগুলি পড়লো, যুদ্ধের প্রতিপক্ষরূপে তারা হয়তো আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করত, কিন্তু তবু বক্তৃতাগুলি তাদের চিন্তা জাগ্রত করল।

১৯১৭ সালে পোপ যখন শান্তির বার্তা প্রচার করেন, তখন তিনি একাকীই অরণ্যে রোদন করেন নি। কেরেনেস্কী মার্চ মাসে রাশিয়ার জার সরকারের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং উইলসন সে ঘটনাকে সম্বর্ধিত করেন এই কথা বলে যে, জগতের আর একটি জাতি যুগ-জীর্ণ-স্বৈরতন্ত্রের শাসন শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করল। নভেম্বর মাসে দ্বিতীয় আর একটি যে বিপ্লবের আঘাত রাশিয়ার ভিত্তিমূল ধরে নাড়া দিয়ে যায়, বল্‌শেভিকদের চূড়ান্ত বিজয়ে তার পরিসমাপ্তি। রাশিয়ার এই নূতন শাসকমণ্ডলীর প্রথম কাজই হল, যুদ্ধমান জাতি সমূহের উদ্দেশ্যে শান্তির আবেদন প্রচার করা এবং তা করতে গিয়ে গোপন চুক্তি

সংক্রান্ত যে সব দলিলপত্র পেট্রোগ্রাদের সরকারী মহাফেজখানায় রক্ষিত ছিল সেগুলি তাঁরা প্রকাশ ও প্রচার করে দিলেন। কূটনীতির ইতিহাসে এ এক দুঃসাহসিক ঘটনা, এক অভিনব ব্যবস্থা। এর ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে গোপন বোঝা-পড়া যেমন দুঃসাধ্য, তেমনি বিপজ্জনক হয়ে উঠে।

৮ই জানুয়ারী তারিখে প্রেসিডেন্ট উইলসন পুনরায় কংগ্রেসের যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দেন। সে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বিবৃত করেন আমেরিকার যুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্য এবং আমেরিকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করেন শান্তির শর্তাবলী:

রাশিয়ার বর্তমান নেতৃবৃন্দ বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমরা কিন্তু এই আন্তরিক আশা পোষণ করি যে, রুশীয় জনসাধারণ যাতে স্বাধীনতার পরিপূর্ণ আশীর্বাদ এবং নিরুপদ্রব শান্তি ও শৃঙ্খলা ভোগ করতে পারে সে দিক দিয়ে তাদের সাহায্য করবার সুযোগ অর্জনের পক্ষে কোন না কোন পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবেই।

এ যুদ্ধে আমাদের নিজস্ব কোন স্বার্থ আমরা দাবি করি না। আমরা চাই, পৃথিবীটা বসবাসের পক্ষে নিরাপদ হোক, বিশেষতঃ আমাদেরই মত শান্তিপ্রিয় যে সব জাতি চায়, নিজেদের মনোমত জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে, নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠান নিজেদের ইচ্ছামত গড়ে তুলতে স্বার্থগৃধ্নু আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে যারা চায় অন্যান্য জাতির কাছ থেকে ন্যায় ও সুবিচার, আমরা চাই বিশ্ব তাদের পক্ষে শান্তি ও নিরাপত্তার আলয় হোক।

উইলসন তাঁর বিশ্ববিশ্রুত চোদ্দ দফা শর্ত সম্বলিত শান্তি প্রস্তাব পেশ করলেন।

(১) শান্তি-চুক্তি প্রকাশ্যভাবে সম্পাদন করতে হবে এবং তা সম্পাদিত হবার পর গোপনে আর অন্য কোনপ্রকার আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া করা চলবে না; কূটনীতিকে গোপন সুড়ঙ্গ পথ পরিহার করে লোক লোচনের সম্মুখে সদর রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াতে হবে।

(২) কি শান্তি কি সংগ্রাম সকল সময়েই জাহাজ সমূহকে আঞ্চলিক অধিকার সীমার বাইরে অবস্থিত সমুদ্র পথে স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য অবাধ অধিকার দিতে হবে।

(৩) যে সব জাতি শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী এবং শান্তি রক্ষার সহায়ক তাদের ব্যবসাও বাণিজ্যগত সমানাধিকারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে যতকিছু অর্থনৈতিক বাধা বিঘ্ন আছে সে সব যথা সম্ভব দূরীভূত করতে হবে।

(৪) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অস্ত্র শস্ত্রের পরিমাণ যে যথাসম্ভব হ্রাস করা হবে সে সম্পর্কে যথাযোগ্য নিশ্চয়তার আদান প্রদান হওয়া চাই।

(৫) ঔপনিবেশিক দাবির ন্যায্যতা বিচার করতে হবে খোলা এবং সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে, সে বিচার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হবে এই নৈতিক ভিত্তির ওপর যে, সার্বভৌমত্ব সংক্রান্ত স্বার্থ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের সময়ে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণেরও তত্রত্য সরকারের স্বার্থকে বিচারের তুলাদণ্ডে এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে করে তাদের মধ্যে গুরুত্বগত সমতা রক্ষিত হয়। অবশ্য সরকারী দাবির ন্যায্যতাও প্রমাণ সাপেক্ষ।

(৬) রুশীয় অঞ্চলকে জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করা ও রাশিয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ সহযোগিতার দ্বারা এবং তা করতে হবে এমনভাবে যার ফলে নিজের রাজনৈতিক নিয়তি ও জাতীয় নীতি নির্ধারণের অবাধ ও অসপত্ন্য অধিকার সে প্রাপ্ত হয়।

(৭) বেলজিয়ামকে যে অধিকার মুক্ত ও তার পূর্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সে সম্বন্ধে সমগ্র বিশ্ব একমত ; এমন কোন কিছু করা চলবে না যার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় তাহারও প্রাপ্য সার্বভৌম অধিকারের সীমা অনুমাত্র সঙ্কুচিত বা সীমিত হয়।

(৮) ফ্রান্সের সমুদয় অঞ্চল জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত করে ফ্রান্সকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং ১৮৭১ সালে আলসেস্ লোরেনের ব্যাপারে প্রাসিয়া ফ্রান্সের যে ক্ষতি সাধন করেছে তা পূরণ করতে হবে, কারণ সে ব্যাপ্যার যে কেবলমাত্র ফ্রান্সেরই ক্ষতি সাধন করেছে তাই নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বের শান্তি আলোড়িত করে রেখেছে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে।

(৯) ইতালীয় সীমান্তের পুনর্বিন্যাস করতে হবে সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত ও স্বীকৃত দেশীয় সীমারেখা ধরে।

(১০) অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী যাতে করে নিজেকে স্বয়ং শাসিত অঞ্চল রূপে গড়ে তুলতে পারে তার পরিপূর্ণ সুযোগ তাকে দান করতে হবে।

(১১) রুমেনিয়া, সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোকে দখল মুক্ত করতে হবে, হৃত রাজ্য ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের হাতে; সার্বিয়া যাতে সমুদ্রে বের হবার অবাধ পথ পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং বলকান্ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে ইতিহাসের, জাতীয়তার ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ধারা অনুবর্তন করে।

(১২) তুরস্কের যে অংশটুকু অটোম্যান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত তাকে নিরাপদ সার্বভৌমত্বের অধিকার দান করতে হবে; অন্যান্য জাতির যে সব লোক তুরস্কের শাসনাধীনে বাস করছে তারা যাতে নিজেদের নিয়তি গড়ে তোলবার অবাধ ও অক্ষুণ্ণ অধিকার লাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং দার্দেনেলিশ প্রণালী পথে সকল জাতির বাণিজ্য জাহাজ যাতে অবাধে সব সময়ে যাওয়া আসা করতে পারে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক নিশ্চয়তা দান করতে হবে।

(১৩) যাদের পোল জাতীয়তা প্রশ্নাতীত তারা যে সব অঞ্চলের অধিবাসী সেই এলাকাগুলি নিয়ে একটি স্বাধীন পোল রাজ্যগঠন করতে হবে।

(১৪) কি ছোট, কি বড় সকল রাজ্যই যাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক সার্বভৌমত্ব ভোগ করতে পারে সে সম্পর্কে পারস্পরিক নিশ্চয়তা দানের উদ্দেশ্যে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হয়ে এক সাধারণ জাতি সমবায় গঠন করতে হবে।

সুনির্দিষ্ট শর্ত সম্বলিত মার্কিন পরিকল্পনার স্বরূপ এই। পরিকল্পনাটি ব্যাপক সমর্থন লাভ করল এবং আমেরিকা যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রেখে যুদ্ধে নেমেছে তার মধ্যে সঞ্চারিত করল এক নূতন প্রেরণা। উইলসনের ভাষণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নিউইয়র্ক ট্রিবিউন বলেন:

এই পরিকল্পনা আমেরিকার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে এক মহান দলিল হিসাবে এবং বিশ্বের স্বাধীনতার স্বপক্ষে আমেরিকার অক্ষয় অবদান রূপে বলতে গেলে, চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সময়ে আমেরিকার ভূমিকা যা হওয়া উচিত প্রেসিডেন্ট বিশ্বজনের দৃষ্টির সম্মুখে সুস্পষ্ট আকারে তা তুলে ধরেছেন।

উইলসনের আ্যাত্মাত্মিক নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এই ঘটনার পরেই। তাঁর উচ্চ আদর্শবাদ সমগ্র জাতিকে অনুপ্রাণিত করে তোলে। ভাবীকালের আশাকে তিনি চিত্রিত করে তোলেন সুস্পষ্ট রেখায় ও রঙে। জীবনের স্বপ্ন এতদিনে পথ পেল পারস্পরিক বিশ্বাস ও শান্তির আনন্দলোকে আপনাকে সার্থক করবার। সত্য কথা বলতে গেলে, তাঁর উক্তি কেবলমাত্র স্বদেশ-বাসিগণকে সম্বোধন করেই উচ্চারিত হয় নি, পরন্তু তা উচ্চারিত হয়ে ছিল মিত্রপক্ষীয় নেতৃবর্গের উদ্দেশে আহ্বান ও সতর্ক বাণী রূপে। আমেরিকার দৃষ্টিতে শান্তির পথ বলতে কি বোঝায় তিনি বস্তুতঃ সেটা তাঁদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন চোখে আঙুল দিয়ে। শান্তির ন্যায় সম্মত শর্ত বলতে যে বস্তুটিকে বোঝায়, আমেরিকার মতে তা এই। আপনারা আমাদের কাছ থেকে সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারেন কেবলমাত্র এই শর্তের ভিত্তিতে। মিত্রপক্ষ তাঁর উক্তির উদ্দেশ্য ও তৎপর্য বুঝতে ভুল করেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, উইলসন কেবলমাত্র তাঁর নিজের দেশেরই নেতা নন, পরন্তু সমগ্র বিশ্ব-মানবতার পক্ষেও তিনি নেতৃস্থানীয়।

১৯১৮ সালের অক্টোবর মাস, অন্তর্বর্তী কালীন নির্বাচনের সময় আগত প্রায়। বছরের গোড়ার দিকে তাঁর যুদ্ধ সংক্রান্ত নীতিকে আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় এবং তার ফলে প্রয়োজন হয় ২৯শে এপ্রিল তারিখে ওভারম্যান অ্যাক্ট পাশ করার। সে দিনের সেই অতীত স্মৃতি প্রেসিডেন্টকে বিচলিত করে তুললো। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন, ডেমোক্রাটিক কংগ্রেসকেই পুনর্নিবাচিত করবার জন্য। তা না করলে লোকে ভাববে, তাঁর পিছনে রয়েছে দ্বিধা-বিভক্ত জনমতের খণ্ডিত সমর্থন এবং তার ফলে অন্যান্য জাতির সঙ্গে কারবারের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। স্পেনিশ আমেরিকান যুদ্ধের সময়ে ম্যাককিন্‌লে ঠিক এই পথই অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর আবেদন বাঞ্ছিত ফল প্রসব করলো না। রিপাবলিকানরা তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটিকে লুফে নিয়ে বললেন, যে পরিস্থিতিকে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত করা কোনক্রমেই উচিত নয়, উইলসন তাকেই ব্যবহার করতে উদ্যত হয়েছেন দলীয় কারবারের মূলধন রূপে। এই প্রচার কার্যের ফলে রিপাবলিকান দল উভয় পরিষদেই যথেষ্ট পরিমাণে লাভবান হলেন এবং তার অনিবার্য পরিণতি দাঁড়ালো এই

এই যে, পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য উইলসনকে অবস্থান করতে হল সংখ্যালঘু দলের নেতারূপে।

কিন্তু দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে বহির্বিশ্বে তাঁর প্রতিষ্ঠা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না। জার্মান জাতিও জার্মান গভর্ণমেণ্টের মধ্যে গভীর ব্যবধানের উপর তিনি যে জোর দেন, শেষ পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হল। তখন পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রায় দুই লক্ষ করে মার্কিন সৈন্য ইউরোপে প্রবেশ করছে, সে জনস্রোতের যেন শেষ নেই। পরিখা আশ্রয় করবার প্রবল আগ্রহ অন্তরে নিয়ে অবিরাম ও অদম্যগতিতে তারা এগিয়ে চলেছে। জার্মানীর সমরনায়কগণ প্রমাদ গণলেন। কাইজার সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়ালেন এবং দেশের শাসন দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করলেন উদারনৈতিক দল। এতদিনে জার্মান জাতি তাদের অন্তরের কথা খুলে বলবার ভাষা খুজে পেল। তারা ঘোষণা করলো, "চোদ্দ দফা শর্ত স্বীকার করে নিয়েই আমরা শান্তি স্থাপন করতে সম্মত"। মিত্রপক্ষ সে প্রস্তাব মেনে নিলেন।

ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের উপর সহসা নিস্তব্ধতা নেমে এলো ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখে। যে উচ্চ কোলাহল গত চার বছরের মধ্যে একদিনের জন্যও বিরাম জানে নি, তার মুখর কণ্ঠ এতদিনে মৌনতায় বিলীন হয়ে গেল। যুদ্ধ বিরতি সংক্রান্ত ঘোষণা প্রচারিত হল শান্তি স্থাপনের সময় সমাগত।

আট

শান্তির অন্তরায়

১৪ই ডিসেম্বরের সকাল। সমগ্র প্যারিস সহরটা কলরব মুখর জনতার উচ্চ চিৎকারে ঠিক তেমনি ভাবেই উত্তেজনায় উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে—একমাস পূর্বে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে যেমন সে হয়েছিল। কিন্তু তবু সে দিনের সঙ্গে এদিনের একটু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আজকের এই উচ্ছ্বাস উল্লাস-জনিত নয়। কোলাহল মুখর এই যে জনতা হাঁপাতে হাঁপাতে ঠেলে-ঠুলে এগিয়ে চলেছে—এদের অখণ্ড মনোযোগ নিবদ্ধ রয়েছে একটি মাত্র ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, সে ব্যক্তিটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তির রচয়িতা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন, জনতার সম্বর্ধনার জবাবে সহাস্যে রেশমী টুপী আন্দোলিত করতে করতে গাড়ী হাঁকিয়ে তিনি প্যারিসের পথ দিয়ে চলেছেন। তিনিই আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট যিনি স্বদেশ ছেড়ে ইউরোপ পরিদর্শনে বেরিয়েছেন এবং উপনীত হয়েছেন এসে প্যারিসে। জনতার সে সম্বর্ধনা যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত।

ফ্রান্সে আগমন উপলক্ষে যে অভিনন্দন তাঁকে জানানো হয় তা যে আনন্দদায়ক তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু জনতার সম্বর্ধনা কুড়োবার উদ্দেশ্যে তাঁর এই ইউরোপ পরিদর্শনের পরিকল্পনা রচিত হয় নি। তিনি যে একটা

প্রচলিত প্রথা ভঙ্গ করতে চলেছেন তার জন্যও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র গর্ব বোধ ছিল না। আর কেনই বা থাকবে! প্রথা লঙ্ঘনের অজস্র দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন-পথের দুধারে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। যে সব শর্তের উপরে ভিত্তি করে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি জানতেন যে তার গুরুত্ব অপরিসীম। যুক্তরাষ্ট্রকে পরিপূর্ণরূপে যুদ্ধ-ক্ষম করে তোলার পক্ষে তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শান্তির চিন্তাই তাঁর মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে থাকতো। ন্যায় সঙ্গত শর্তে শান্তি স্থাপন যদি সম্ভব হয় তা হলে গত চার বছরের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার নিরসন হবে এবং তৎসহ রুদ্ধ হবে তার পুনরাবৃত্তির পথ।

কংগ্রেসে তিনি ভাষণ দেন ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে। শ্রোতাদের সম্বোধন করে তখন তিনি বলেন যে, প্যারিসে অতি সত্বর যে আলোচনা অনুষ্ঠিত ও যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে চলেছে, আমেরিকার নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপারে এমন কোন সমস্যা নেই—গুরুত্বের দিক দিয়ে সে সমস্যা তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে। যুদ্ধ অন্তে অবলম্বনীয় মনোভাব সম্বন্ধে আদর্শের দিক দিয়ে তিনি যে ব্যাখ্যা দান করেন, মিত্রশক্তিবর্গ এবং জার্মানী উভয় পক্ষই তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল। এখন তিনি তার সঙ্গে এই কথা কয়টি যোগ করে দিবেন: "আমার বক্তব্য শুধু এই যে, সে আদর্শের কোন ভুল বা মিথ্যা ব্যাখ্যা যাতে দেওয়া না হয় এবং সে আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে চেষ্টার যাতে কিছুমাত্র ত্রুটী না হয় তা দেখবার দায়িত্ব রয়েছে আমার উপরে।" তাঁর ইচ্ছা ছিল, শান্তি-সম্মেলনে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকবেন এবং স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষে মাকিন মনোভাব তিনি উপস্থাপিত করবেন নিজে। কিন্তু কংগ্রেস তাঁর সে প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হল না।

উইলসন যখন জাহাজ যোগে নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করেন, তখন কামান-গুলো অগ্নি উদ্গীরণ করবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে, সাইরেণের উচ্চ চিৎকারে বন্দর বিধূনিত, উড্ডীয়মান বিমান সমূহের পক্ষচ্ছায়ায় বন্দর সমাচ্ছন্ন বিভিন্ন আকার ও প্রকারের জাহাজসমূহ ভীড় করে এসেছে বন্দরে। সর্বোপরি, গভর্ণরস আইল্যাণ্ড প্রকম্পিত করে গর্জে উঠলো একুশটি তোপের আওয়াজ। প্রেসিডেন্টকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তোপধ্বনি এই সর্ব-প্রথম।

প্রেসিডেন্ট যাত্রা করলেন পিছনে বিতর্কের তরঙ্গ তুলে দিয়ে। প্রবাস-যাত্রা প্রেসিডেন্টের পক্ষে উচিত হবে কি? কর্তব্য হবে কি শান্তি সম্মেলনে তাঁর স্বয়ং উপস্থিত হওয়া? উত্তেজনাপূর্ণ এই আবহাওয়ার মধ্যে যে প্রচার এবং প্রশংসা মার্কিন জাতির প্রাপ্য, তা নিজের জন্য সংগ্রহ করাই কি তাঁর বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্য নয়? এই সব প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী লেন যে জবাব দেন তা জলন্ত অনলবর্ষী:

পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যিনি প্রতিনিধি তিনি ইউরোপে যাচ্ছেন শোভাযাত্রা সহকারে শাঁসেলিজে পরিক্রমা করবার জন্য নয়, ফরাসী জনসাধারণের সপ্রশংস সম্বর্ধনা গ্রহণ করবার জন্যও নয়। আমেরিকার আদর্শের বার্তাবাহীরূপে তিনি ইউরোপ যাচ্ছেন দেখবার জন্য যাতে যুদ্ধের মধ্য থেকে উদ্ভব হয় এমন কিছুর যা কাম্য ও কল্যাণকর। যে নীতির আমরা সমর্থক, যে প্রতিষ্ঠানকে আমরা ভালবাসি এবং কামনা করি পৃথিবীময় যার প্রসার—তার প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য তিনি যদি স্বয়ং প্যারিসে উপস্থিত না হতেন, তাহলে তিনি অভিযুক্ত হতেন কর্তব্যের প্রতি উদাসীনতা, আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং মনুষ্যত্বের প্রতি অবমাননার অপরাধে।

আতলান্তিক মহাসাগর পার হতে যতটুকু সময় লেগেছিল, সেই স্বল্পমাত্র সময়ের জন্য আমেরিকার রাজনীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ইউরোপে তাঁর জন্য প্রতীক্ষমান জটিল সমস্যা সমূহের দুর্ভাবনা থেকে প্রেসিডেন্ট নিজের মনকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। করণীয় কাজের দুরূহতা সম্বন্ধে তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন না তাঁর প্রস্তুতির মধ্যে অবসর যাপনের উপযোগী উদ্যোগ আয়োজনের চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। শান্তি-সম্মেলনে যাঁরা আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁরা সকলেই তাঁর সহযাত্রী। তাঁরা হলেন, পররাষ্ট্র সচিব ল্যানসেন, জেনারেল টাস্কার, এইচ, ব্লিস; ফ্রান্সের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হেন্‌রী হোয়াইট এবং কর্ণেল হাউস। এই শেষোক্ত ব্যক্তির দূরদর্শিতাক্রমে বিভিন্ন ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ এমন কয়েকজন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা রূপে তাঁদের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়, প্রয়োজন হলে যাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞ অভিমত জ্ঞাপন করতে পারেন।

প্রস্তুতি পর্ব বিরাট আকারের হলেও, প্রেসিডেন্টের লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত সহজ ও সরল। আমেরিকার যে আদর্শকে তিনি মনে মনে গঠন করেছেন এবং ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, তাকে তিনি বহন করে নিয়ে যেতে চান দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে, তাকে ছড়িয়ে দিতে চান উদার ও উন্মুক্ত বহির্বিশ্বে। এ ছাড়া নতুন কোন পরিকল্পনা তাঁর ছিল না। তার পরিবর্তে তিনি সঙ্গে করে ইউরোপে নিয়ে চলেছেন আমেরিকার সংবিধান, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, ভার্জিনিয়ার বিল অব্ রাইট্স। এক কথায় বলতে গেলে, আমেরিকার সমুদয় আত্মিক সম্পদ। জাতিসঙ্ঘ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—এই মাত্র তাঁর কর্ম তালিকার কার্যক্রম।

প্যারিসে উপনীত হলে প্রেসিডেন্ট উইলসনকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় তার মধ্যে ছিল আমেরিকার প্রতিনিধির প্রাপ্য আন্তরিকতার চেয়ে আরও কিছু বেশী। মিত্রপক্ষকে যুদ্ধে জয়ী করবার জন্য যে জাতি এমন বিরাট ভূমিকা অভিনয় করেছে—এ অভিনন্দন তারও উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত। আশার আলোক-রশ্মি বিশ্বময় বিকীরিত হল মাত্র ক্ষণিকের জন্য; মনে হল, রাজনীতিকদের দাবি ও ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থ হেলা ভরে উপেক্ষা করে ন্যায় বিচার বুঝি বা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ জর্জরিত বিশ্বের রণক্লান্ত ও দৈন্যক্লিষ্ট নর-নারীর আত্মিক চেতনা যে উচ্চস্তরে উন্নীত হল, ইতিপূর্বে আর কোন দিন সে পর্যায়ে পৌছায় নি, মানবিকতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে বিশ্বকে নতুন করে গড়ে তুলতে তারা যেন বদ্ধপরিকর।

প্রেসিডেন্ট উইলসন এই আশা ও আশ্বাসের জীবন্ত প্রতীক। আত্মিক এই প্রেরণা সঞ্চিরীত থাকাকালে শান্তি-সম্মেলন অধিবেশন রত হওয়া যদি সম্ভব হত তা হলে ইতিহাস পুনর্লিখিত হতে পারত গৌরবময় স্বর্ণোজ্জ্বল অক্ষরে। কিন্তু উইলসন-পরিকল্পনা মিত্রপক্ষীয়-পরিকল্পনা নয় এবং উইলসন-পরিকল্পিত। শান্তি ও তাঁদের মনোমত বস্তু নয়। এই ধরণের নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রবৃত্তির ভিত্তিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি এবং সেই প্রবৃত্তির প্রেরণা বশে দুঃখ-দুর্ভোগময় এই দীর্ঘ পথ সে অতিবাহন করেও আসে নি। বিজয়-বিহীন-শান্তি! আদর্শবাদিতার অলীক স্বপ্ন—নির্বুদ্ধিতার কী চরম পরাকাষ্ঠা!

উইলসনের উপস্থিতির ফলে সমগ্র ইউরোপের উপর দিয়ে উৎসাহের যে প্লাবন বয়ে যায় তা দেখে মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের শঙ্কিত না হওয়া

আদৌ অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। জনতার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজনীতিক হিসেবে তাঁরা এ কথা ভাল ভাবেই জানতেন যে, জনতার ভাব-প্রবণতার স্থায়িত্ব কাল স্বল্প-পরিমিত। উইলসন দেবদূত-রূপে এ দেশে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন এমন এক নবযুগ আনায়ন করতে স্বৈরাচার এবং দারিদ্র্য যেখানে থাকবে না—জনসাধারণের এ বিশ্বাসও যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না এ কথাও তাঁদের অজ্ঞাত নয়। এ কথাও তাঁরা তাচ্ছিল্যভরে বিশ্বাস করতেন যে, জনসাধারণ যথাসময়ে তাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক মনোভাব ফিরে পাবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই তাঁরা শান্তি-সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে কালহরণের নীতি অনুসরণ করে চললেন। বস্তুবাদীদের এ বিশ্বাস যে ভ্রান্ত নয় তা প্রমাণিত করে অচিরে জন-মনের পরিবর্তন সুরু হল। জনসাধারণ তাদের ক্ষয়-ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্ভোগের কথা ভোলে নি, কাজেই আবার নতুন করে জেগে উঠলো পুরাতন ঘৃণা ও বিদ্বেষ। যারা যুদ্ধ করেছে এবং যুদ্ধে জয়লাভ করেছে, তারা তাদের প্রাপ্য পাউণ্ড পরিমাণ মাংস থেকে নিজেদের বঞ্চিত হতে দিতে নারাজ।

মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিটি দেশ সোৎসাহে উইলসনের উদ্দেশে সম্বর্ধনা জানালো—সম্বর্ধনা জানালো ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ইতালি। রাজন্যবর্গ তাঁকে ভূষিত করলেন সম্মানের অজস্র বর্ষণে, জনসাধারণ তাঁকে অভিনন্দিত করল সানন্দ-সম্বর্ধনার দ্বারা। তিনি পরিদর্শন করতে অস্বীকৃত হলেন কেবল একটি মাত্র যায়গা। ফ্রান্সের যে অঞ্চলটি যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত হয়েছে, সেখানে যেতে তিনি কিছুতেই সম্মত হলেন না। তিনি ভাবলেন, ক্রোধের তাড়নায় যার নিজের মন বিক্ষিপ্ত, শান্তি স্থাপনের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করা তার কদাচ কর্তব্য নয়।

তিনি খ্রীষ্টমাস-উৎসব যাপন করলেন ফ্রান্সে অবস্থিত মার্কিন সৈন্যদলের সাহচর্যে। একদিন জেনারেল পার্শিং-এর সঙ্গে তিনি সৈন্যদল পরিদর্শণে বেরিয়েছেন। জেনারেল পার্শিং সেনাবাহিনীর কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে করতে হঠাৎ জনৈক সৈনিকের সাজ-সরঞ্জামের মধ্যে থেকে তাঁবু খাটাবার একটা ভাঁজকরা ডাণ্ডা তুলে নিলেন এবং কি ভাবে সেটাকে কাজে লাগানো হয় তাই বোঝাতে লাগলেন। বোঝানো শেষ হয়ে গেলে সেটাকে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, সেই সব সাজ-সরঞ্জামের ভেতর যেখানে প্রতিটি জিনিস রক্ষিত আছে যথাস্থানে।

উইলসন জেনারেলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমরা চলে যাবার পর এদের আর পরীক্ষা করা হবে না বোধ হয়।"

"আজ্ঞে, তা হয়তো হতে পারে"।

"আর একটা কথা, জেনারেল : সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়করূপে আমি আপনাকে নির্দেশ দিতে পারি, কেমন না ?"

"নিশ্চয় পারেন।"

"তাহলে জেনারেল, আমি বলছি, ডাণ্ডাটা, যথাস্থানে রেখে দিন।"

জেনারেল তৎক্ষণাৎ সহাস্যে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং যথাস্থানে রেখে দিলেন ডাণ্ডাটিকে। পরীক্ষাধীন কোন কোন সৈনিক বলে, প্রেসিডেণ্ট নাকি তাদের দিকে চেয়ে চোখ টিপেছিলেন।

শান্তি-সম্মেলনের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন সুরু হল ১৮ই জানুয়ারী তারিখে। সামরিক কর্মচারীদের গায়ে বিচিত্র বর্ণের উর্দী, প্রাচ্য-দেশীয় কোন কোন প্রতিনিধির পরিধানে বর্ণাঢ্য বেশভূষা সবে মিলে সে এক চমৎকার দৃশ্য; প্রকাশ্য অধিবেশনে কোন কাজই যে করা সম্ভব নয় সে কথা বুঝতে মোটেই বিলম্ব হল না। বহু সংখ্যক প্রতিনিধিদের মধ্যে উঠেছে বহু বিচিত্র ভাষার এক মিশ্র হট্টগোল! তাঁদের বিভিন্ন ভাষায় প্রদত্ত তাঁদের ভাষণ অনুবাদ করতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। কার্যপ্রণালী যেমন জটিল তেমনি গুরুভার। সম্মেলনকে ভেঙ্গে তাই বিভিন্ন কমিটিতে বিভক্ত করে দেওয়া হল। 'কাউন্সিল অব্ টেন' এই কমিটিগুলির অন্যতম। ফ্রান্স, গ্রেটবৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও জাপান এই পাঁচটি দেশের প্রত্যেকটি থেকে দু'জন করে সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলো এবং সে প্রতিবাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলালো সংবাদপত্রসমূহ। তাদের বক্তব্য হল বড় বড় দেশগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আলোচনা সভায় ছোট ছোট দেশের প্রতিনিধিরা যদি অংশ গ্রহণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে তাঁদের বক্তব্য তাঁরা বলবার সুযোগ পাবেন কোথায় এবং কোথায় বা রইবে প্রকাশ্য চুক্তির মর্যাদা? উইলসন অবস্থাটা বুঝিয়ে দেবার জন্য বললেন, পরামর্শদানের জন্য আহূত উপদেষ্টাদের ভীড়ে এমন কি ছোট ছোট সভাগুলিতে পর্যন্ত কোন সময়ে তিল ধারণের স্থান থাকে না। সাংবাদিকদের তিনি বললেন, তিনি যখন প্রকাশ্য চুক্তির কথা বলেন তখন

তিনি এমন কথা বলতে চাননি যে, গোপন আলোচনা-সভার আদৌ কোন অনুষ্ঠানই হবে না। তিনি এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে, আলোচনা-সভার সিদ্ধান্তগুলি হবে প্রকাশ্য, স্পষ্ট ও জনসাধারণের জন্য প্রচারিত।

মিত্রপক্ষ মনে করলেন, 'বিজয়-বর্জিত-শান্তি' এক অর্থহীন প্রলাপ! যুদ্ধে তাঁরা জয়লাভ করেছেন এবং তৎসত্ত্বেও যে তাঁরা বার্লিন অভিযান করেন নি এই তো তাঁদের পক্ষে এক পরম মহানুভবতা : যুদ্ধের যা কিছু লুণ্ঠিত সম্পদ সে সবই বিজয়ী পক্ষের প্রাপ্য এই তো সাধারণ নিয়ম। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী ছোটো ও বড় প্রতিটি দেশের প্রতিনিধি কার্যত দাবি করলেন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উপনিবেশ অথবা অঞ্চল-বিশেষের অধিকার।

দশজন সদস্য সম্বলিত কাউন্সিল কাজে নেমে পড়লেন সংগঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। কাউন্সিলের অধিবেশন সমূহে সভাপতিত্ব করেন যদিও ক্লিমেন্সো, তথাপি উড্রো উইলসনই ছিলেন তাদের কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি। যে কোন্ প্রশ্নই আলোচিত হোক না কেন, সকলে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন মার্কিণ প্রেসিডেন্টের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য, আলোচনা চলাকালে সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো তাঁর শান্ত ও নিরুদ্বেগ মুখচ্ছবির উপর।

সম্মেলনে যোগদানের জন্য উইলসন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছেন, কাজেই নিজের আদর্শ থেকে সরে দাঁড়াতে তিনি আদৌ সম্মত নন। তিনি ঘোষণা করলেন, শান্তি স্থাপন করতে হবে স্থায়িত্ব ও সমতার দিকে দৃষ্টি রেখে এবং জাতিসঙ্ঘই হবে তার ভিত্তি প্রস্তর। প্রতিনিধিদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো : তাঁরা বললেন, আগে শান্তির শর্তাবলীই নির্ধারিত হোক, তারপর জাতিসঙ্ঘের কথা ভাববার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু এ ব্যাপারে উইলসন অনড় এবং অচল। শান্তির অস্তিত্ব যে নিহিত রয়েছে জাতিসঙ্ঘের মধ্যে এই কথাটাই আগে সাব্যস্ত হোক, অন্যান্য বিস্তৃত বিবরণ আসবে তারপরে। তবে তাই হোক : জাতিসঙ্ঘই স্বীকৃত হোক শান্তি চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে। সে বিষয়ের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হলো যে কমিটির ওপর উইলসন হলেন তার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা।

দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ জাতিসঙ্ঘের কথা ভাবতে শুরু করেন ষোড়শ শতাব্দী থেকে যুদ্ধের সূচনাতেই ইংলণ্ডের লর্ড গ্রে এবং আমেরিকার প্রাক্তন

প্রেসিডেণ্ট টাফ্‌ট এইরূপ একটি সংস্থা গড়ার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। এই সব আদর্শবাদী ও স্বপ্নবিলাসী ব্যক্তিগণ এমন একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন, মাত্র যার ফলে যুদ্ধ অসম্ভব হয়ে উঠবে, তার বেশী কিছু করা তাঁদের কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নি। উইলসন কিন্তু প্রস্তাব মাত্র উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হবার পাত্র নন। তিনি বিভিন্ন জাতির সমবায়ে একটা বিরাট বিশ্বভ্রাতৃত্ব-সঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চললেন এমন একটা যুগে— যখন প্রতিটি দেশ তার প্রতিবেশী দেশকে সন্দেহ করছে সম্ভাব্য শত্রু রূপে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট লীগ সংক্রান্ত খসড়া চুক্তি পত্র শান্তি সম্মলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে দাখিল করেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। সে খসড়া সন্থ বেরিয়ে এসেছে কমিটি থেকে। উক্ত খসড়া শান্ত ও সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত হল। চুক্তিপত্রের ভূমিকাতেই লীগের উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত আভাস পাওয়া যায়:

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ জাতিসঙ্ঘের গঠনতন্ত্র গ্রহণ করলেন এই আদর্শের উপর ভিত্তি করে যে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা, শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের জন্য তাঁরা সচেষ্ট হবেন, যুদ্ধের পথ গ্রহণ না করতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রকাশ্য, ন্যায়সম্মত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করবেন, গভর্ণমেণ্ট সমূহের মধ্যে পারস্পরিক আচরণ-বিধি নির্ধারণ করবেন আন্তর্জাতিক আইন ও বোঝাপড়ার সাহায্যে, সঙ্ঘবদ্ধ জাতিসমূহ এমন ভাবে তাঁদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করবেন যার ফলে ন্যায় বিচারের ও সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলীর মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষিত হয়।

উইলসন স্বদেশের পথে যাত্রা করলেন তার পর দিনই কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তির ফলে বহু বিল তাঁর স্বাক্ষর লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছে। তা'ছাড়া আভ্যন্তরীণ নীতি ঘটিত বহু ব্যাপারের জন্যও তাঁর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ইউরোপে কাজ হয়েছে যথেষ্ট। জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র গৃহীত হওয়ার ফলে সেই নয়া দুনিয়ারই ভিত্তি পত্তন হল যার অস্তিত্বের আভাস জেগে ওঠে জেফারসনের স্বপ্নে; ম্যাজিনীর আদর্শ বাস্তবে আকার নিতে আরম্ভ করেছে।

ফ্রান্সে ফিরে যাবার পূর্বে যে একমাস কাল উইলসন যুক্তরাষ্ট্রে যাপন করেন, তখনই তিনি বুঝতে পারেন যে, প্যারিসের কার্যাবলীর বিরুদ্ধে

বিক্ষোভের একটা প্রচ্ছন্ন স্রোত বয়ে চলেছে অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত। সে বিক্ষোভ প্রকটতর আকারে প্রকাশ পেল আমেরিকার জাতিসঙ্ঘে যোগদানের বিরুদ্ধে। সিনেট বৈরীভাবাপন্ন এবং শোনা যাচ্ছিল; সে বৈরীতা হয়তো বা সক্রিয়ভাবে আত্ম প্রকাশ করবে। দ্বিতীয়বার ইউরোপ যাত্রার পূর্বে উইলসন নিউইয়র্কে যে ভাষণ দেন তাতে জাতিসঙ্ঘের বিরুদ্ধ-বাদীদের প্রতি পরিপূর্ণ উপেক্ষাই প্রদর্শিত হয়। তিনি রূঢ়তার সঙ্গেও স্পষ্ট ভাবেই এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

চুক্তিপত্র এখানে ফিরে এলে এদিকের ভদ্রমহোদয়গণ দেখবেন যে, জাতি-সঙ্ঘ সংক্রান্ত দলিল যে শুধু চুক্তি পত্রের অঙ্গীভূতই হয়ে আছে তা নয়, পরন্তু চুক্তিপত্রের সঙ্গে সে দলিল এতো বিভিন্ন প্রকারের বহু সংখ্যক সম্পর্কের সূত্রে জড়িত যে, সমগ্র সৌধটী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না করে একের থেকে অপরকে বিচ্ছিন্ন করা চলবে না।

আবার প্যারিসে এসে উইলসন দশজন সদস্য সম্বলিত কাউন্সিলের মাধ্যমে কাজে নেমে পড়লেন। আকারগত দৈর্ঘ্যের দরুণ কাউন্সিল তার কার্য ক্ষমতা হারালে মাঝে মাঝে তিনি কাজ করতেন বৃহৎ শক্তি চতুষ্টয়ের অন্যতম রূপে। নূতন গভর্ণমেণ্ট সমূহের গঠন' অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনঃ ব্যবস্থাপনা। এক কথায় সমগ্র সভ্য জগতের নিয়তি তখন নির্ভর করছে যে চারজন ব্যক্তির হাতে, তাঁরা হলেন, উইলসন, লয়েড জর্জ, ক্লিমেন্সো, এবং অর্ল্যাণ্ডো।

তাঁরা নিজেদের মনে বীরত্বের বিন্দুমাত্র গর্ববোধ পোষণ করতেন না। উইলসন যে বাড়ীতে বাস করতেন সেখানে উত্তাপের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল-না বলে তিনি গা গরম করে তোলবার জন্য মাঝে মাঝে দ্রুত পায়চারি করতেন। লয়েড জর্জ ছুটে বেরিয়ে আসতেন তাঁর ঘর থেকে তিনি বলতেন, লুই ফিলিপের পর সে ঘরের হাওয়া আজও বদলায় নি। আমুদে ও স্ফূর্তিবাজ অর্ল্যাণ্ডোর কাছ থেকে তৎক্ষণাৎ সাড়া আসতো যে কোন ভাবাবেগের জবাবে। বৃদ্ধ শার্দুল ক্লিমেন্সোর কণ্ঠস্বর যদিও তখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তবু যে কোন লঘু ব্যাপারের ওপরেও তাঁর বজ্রমুষ্টি তখন পর্যন্ত এতটুকু শিথিল হয়নি। জটিল-সীমান্ত-রেখা সমূহ চিহ্নিত করা যে বিশাল মানচিত্র মেঝের উপর বিছানো থাকতো, বিরাট এই ব্যক্তি চতুষ্টয় মাঝে মাঝে চার হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে তা পরীক্ষা করতেন।

কখনও বা তাঁরা রচনা করতেন শান্তির শর্তাবলী। সেখানেও উইলসনের ধ্বনিঃ ছিল, 'বিজয়-বিহীন-শান্তি'। খোলা চুক্তিনামা, ন্যায় বিচার, ছোটো ছোটো দেশগুলির অধিকার সম্বলিত দাবিসমূহ মূলতঃ এতো সহজ ও সরল যে, তাদের মধ্যে একটিকে স্বীকার করে নিলে অপরটি অপরিহার্যরূপে আপনা হতেই এসে পড়ে। কিন্তু তবু ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে কূটনীতি যে খাতে প্রবাহিত হয়ে আসছে—এ ধারণার সঙ্গে তা সংঘাতশীল। ব্যক্তি-এয়ের প্রত্যেকেই যখন উইলসন পরিকল্পনার বিরোধিতা করছেন, তখন তাঁরা মনে মনে পোষণ করেছেন আপন আপন বিশেষ সুখ-সুবিধা আদায়ের দাবি। একথা তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, কেবলমাত্র তাঁদের ব্যক্তিগত মর্যাদাই নয়, পরন্তু তাঁদের স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টের মর্যাদা পর্যন্ত নির্ভর করছে তাঁদের কৃতকার্যতার উপরে।

তদুপরি, প্রেসিডেণ্ট অচিরেই জানতে পারলেন যে, সমতার ভিত্তিতে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বানচাল করে দেবার জন্য গোপন চুক্তি সম্পাদনের ষড়যন্ত্র অদূরে ঘনিয়ে উঠছে। শান্তি স্থাপিত হবার আগেই বিভিন্ন জাতি যুদ্ধের লুণ্ঠন-লব্ধ সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা প্রায় কায়েম করে এনেছে বললেই হয়।

ভার্সাইয়ে বসে চতুঃশক্তি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় প্রতিটি দেশেরই যুদ্ধ-জনিত ক্ষতিপূরণের এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্যান্য সমস্যার সমাধান করতে সচেষ্ট হন। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সে কাজ ইউরোপের পুনর্গঠনের সামিল। এই বিরাট প্রচেষ্টায় তাঁরা সাহায্য লাভ করেন ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ ও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। কিন্তু সে কাজের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার ন্যস্ত থাকে তাঁদের হাতে।

ভার্সাই শান্তি-চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে যে মতবৈধ দেখা দেয় তা ঘটেছিল প্রধানতঃ উইলসন ও ক্লিমেন্সো পদ্ধতিগত পার্থক্যকে কেন্দ্র করে। পুরাতন ও নূতন কূটনীতির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, তাই মূর্ত হয়ে উঠে এই বিরোধের ভেতরে। অর্থাৎ কিনা, আচরণগত যে কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলা অতীতে মেনে চলা হত। বর্তমানও অনুশাসিত হবে তাদের দ্বারা—এই হল আসল বক্তব্য। অগ্নিশর্মা মার্শাল ফচের সাহায্য-পুষ্ট হয়ে ক্লিমেন্সো দাবী

করলেন, জার্মান গভর্ণমেণ্টের নিঃশেষে উচ্ছেদ সাধন ছাড়া অন্য কোন শর্তেই তাঁরা সম্মত হবেন না। জার্মানী তাঁর প্রিয় পিতৃভূমি ফ্রান্সের চিরন্তন শত্রু। জার্মানীর অধিকারে যতক্ষণ সেনাবাহিনী ও সমরাস্ত্র সম্ভার থাকবে, ফ্রান্সের বিপদ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকবে ততক্ষণ। জার্মান সাধারণতন্ত্রের সমূলে উচ্ছেদ সাধনের, তার কাছ থেকে অত্যধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবির পথে এই যে প্রতিবন্ধকতা—এক কথায়, 'বিজয়-বর্জিত-শান্তি' সংক্রান্ত সমগ্র উইলসন পরিকল্পনাই প্রাচীন, অভিজ্ঞ ও কর্মক্লান্ত ক্লিমেন্সোর কাছে একেবারে দুর্বোধ্য। শান্তির অন্তরায়ের ক্ষেত্রেই হোক, অথবা যুদ্ধের উদ্দীপ্ত তাণ্ডবের ক্ষেত্রেই হোক সর্বত্রই ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠা সবার উপরে—এই হল ক্লিমেন্সো-নীতির আসল স্বরূপ এবং সে নীতি থেকে চুল পরিমাণও বিচ্যুত হতে তিনি রাজি নন। লীগ্‌ই যদি একান্ত কাম্য হয় তবে লীগ গঠিত হোক তাতে আমাদের আপত্তি নেই। আমরা চাই নিরাপত্তা এবং তা পাবার পক্ষে পুরাতন প্রথাই আমাদের বিবেচনায় সবচেয়ে নিরাপদ। ফ্রান্সের মতে সে-নিরাপত্তা আনায়নের একমাত্র পন্থা হল জার্মানীর সামরিক ও অর্থনৈতিক বিনাশ সাধন। শান্তির যে চৌদ্দদফা শর্ত মেনে নেবার দিকে সম্মেলন ঝুঁকে আছে তা যদি গৃহীত হয়ও তথাপি ফ্রান্স দাবি করবে, রাইনের নিয়ন্ত্রণ, জার্মান উপনিবেশ সমূহের হস্তান্তর, জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ, বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায় এবং এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন যার ফলে জার্মানীর ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আড্রিয়াতিক সাগর পথের ব্যবসা-বাণিজ্য নিজের নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনবার উদ্দেশ্যে ইতালি দাবি করল, ফিউম পাবার জন্য জাপান চাইল শ্যান্টুং-এর অধিকার পেতে।

যুক্তরাষ্ট্র এ সব কিছুই দাবি করে নি। সে না চাইল রাজ্য, না চাইলো ক্ষতিপূরণ, না চাইল শত্রুপক্ষের শক্তি খর্ব করতে।

জন কয়েক লোকের প্রাণান্ত পরিশ্রমের ফলে যে চুক্তিপত্র চূড়ান্ত ভাবে বেরিয়ে এলো, দেখা গেল, উইলসন তাতে যে সব জিনিস ঢোকাতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলিই তাতে নেই, কেবল তাই নয়, তাতে যে সব জিনিস স্থান পেয়েছে তাদের মধ্যে অনেকগুলির সঙ্গেই তিনি একমত নন। তবু তাঁর অক্লান্ত প্রয়াস ব্যতিরেকে যে শান্তি স্থাপিত হত তার চেয়ে এ শান্তি যে অনেকাংশে ভালো ও সহৃদয় সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

কার্যের অনুরোধে সে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসতে হয়েছে, তার আদি হতে অন্ত অবধি বিরোধ, বিচ্ছেদ ও বিতর্কের তিক্ততায় ভরা। আলোচনার রথচক্র যখন অচল অবস্থায় এসে উপনীত হল, প্রেসিডেণ্ট আদেশ দিলেন তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জর্জওয়াশিংটন নামক জাহাজকে প্রস্তুত থাকতে। আর্ল্যাণ্ডো সম্মেলন থেকে চলে গিয়েও আবার ফিরে এলেন। চীনের প্রতিনিধিরা সেই যে এশিয়ার পথে যাত্রা করলেন আর তাঁরা ফ্রান্সে ফিরে এলেন না। শান্তির পথ সত্য সত্যই ঝটিকা বিক্ষুব্ধ।

৭ই মে লুসিটানিয়া জাহাজ নিমজ্জিত হবার বর্ষপূর্তি দিবস। জার্মান প্রতিনিধিগণ সেই দিন প্যারিসে এসে উপনীত হলে শান্তি চুক্তি পত্রের একটি কপি তাঁদের হাতে অর্পণ করা হল। সে এক চাপা উত্তেজনাপূর্ণ ও গাম্ভীর্য-মণ্ডিত দৃশ্য! পুরাতন শত্রুগণ এই সর্বপ্রথম পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছেন বলে বৈরিতার স্মৃতির দ্বারা আবহাওয়া তিক্ত ও বিষাক্ত হয়ে উঠে। শান্তি সম্বন্ধে জার্মানীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হলেও ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন তারিখে ভার্সাইয়ের হল্ অব্ মিরার্সে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষারিত হল এবং যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হল।

নয়

মানুষ মরণশীল কিন্তু আদর্শ অমর

যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যাবর্তনের পথ প্রেসিডেণ্টের পক্ষে কর্মহীন অবসরময়। সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ও মন অবসন্ন। চিন্তার যে গুরুভার বুকে চেপে রয়েছে তা হতে কয়েক দিনের জন্য অব্যাহতি পাওয়া প্রয়োজন। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী জোসেফ পি, টিউমাল্টী ওয়াশিংটন থেকে তাঁর উপরওয়ালার কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করে আসছেন এবং তাঁর কর্মসূচীর ক্লান্তি-জনক গুরুভার লক্ষ্য করে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। এমন কি, তিনি এই বলে সতর্কও করে দিয়েছিলেন যে, মাত্রাতিরিক্ত শ্রমে শরীরকে যেন পীড়িত করা না হয়। প্রাইভেট সেক্রেটারী এই প্রসঙ্গে 'কনষ্টিটিউশ্যানের' (শারীরিক সংগঠন) কথা উল্লেখ করলে প্রেসিডেণ্ট জবাব দেন, "কনষ্টিটিউশ্যান"! আমি কনষ্টিটিউশ্যান নয় উপধারা বেঁচে আছি।

প্রায় ছয় মাস অনুপস্থিতির পরে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে প্রেসিডেণ্ট নিউইয়র্কে এসে উপনীত হন ৮ই জুলাই তারিখে। এই সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক উপদলগুলি অবশ্য নিষ্ক্রিয় ছিল না।

তিনি যখন বিদেশে বিরাট আন্তর্জাতিক সমস্যা সমূহ নিয়ে বিব্রত, দেশের অভ্যন্তরে তখন অন্তহীন তিক্ত সংগ্রামের জন্য নূতন এক যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত

হচ্ছে। জাতিসঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়েই কি প্রেসিডেণ্ট প্রায় ছয় মাস পূর্বে স্বদেশ হতে যাত্রা করেন নি? সে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁকে এমন বহুনীতি বিসর্জন দিতে হয় যা তাঁর মৌলিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে। শান্তি সম্মেলনের রুদ্ধদ্বার অধিবেশন এতদিনে তাঁর প্রাপ্য খাজনা আদায় করতে সুরু করেছে। লীগের উদ্দেশ্য মার্কিন জনসাধারণের বোধগম্য হল না এবং যাকে তারা বুঝে উঠতে পারলো না, তাকেই তারা সুরু করলো ভয় করতে। তদুপরি বিকৃত ব্যাখ্যা ও বিরূপ জনরব তাকে চিত্রিত করে তুললো ভয়াবহ মূর্তিতে। পুরাতন হস্তক্ষেপ বিরোধী নীতির যাঁরা সমর্থক তাঁরা আন্তর্জাতিক জটিলতার জালে জড়িত হতে চাইলেন না এবং ঘোষণা করলেন, লীগের সঙ্গে আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই। আবার অন্য কারও কারও মতে, লীগ অবশ্য অপরিহার্য। কিন্তু সে লীগ এ লীগ নয়। আরও একদল লোক সংখ্যায় কম হলেও শক্তির দিক দিয়ে যাঁরা সংহত তাঁরা খোলাখুলিভাবেই লীগের বিরোধিতা করতে লাগলেন এই কথা বলে যে, যেহেতু এটা উইলসনের লীগ, অতএব তা অবাঞ্ছিত।

ফিরে আসার দু'দিন পরেই প্রেসিডেণ্ট সিনেটের সম্মুখে শান্তি চুক্তিপত্র উপস্থাপিত করলেন। চুক্তিপত্র যে অনুমোদন লাভ করবে সে সম্বন্ধে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি বললেন পুরাতনের রাজ্যে নূতন কোন ভাবধারা সন্নিবেশিত করা বড় শক্ত ব্যাপার এবং তা করতে গেলে তার ফল সময়ে সময়ে তিক্ত না হয়ে পারে না। সে যাই হোক, মঞ্চ ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হয়েছে এবং ভাবী ঘটনার স্বরূপ হয়েছে উদঘাটিত।

উইলসনের প্রথম বার যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যে চুক্তিপত্র শান্তি-সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত হয় তার সঙ্গে সদ্য উপস্থাপিত শান্তিচুক্তির কিছুটা পার্থক্য ছিল। প্রেসিডেন্টের ধারণা এবং ক্ষণস্থায়ী পরিদর্শনকালে তিনি আমেরিকার জনমত সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পেরেছিলেন সেই অনুসারেই পরিবর্তনটুকু সাধিত হয়েছিল। জনসাধারণের মনে ভয় ছিল যে কর্মগত তাদের স্বাধীনতা হয় তো বলি প্রদত্ত হবে ইউরোপীয় জুলুমের যূপকাষ্ঠে এবং হয় তো বা তাদের সদা-সর্বদার জন্য জড়িত হয়ে থাকতে হবে বৈদেশিক বিরোধ ও সংগ্রামের সঙ্গে। লীগের উগ্র সমর্থক ও প্রাক্তন প্রেসিডেণ্ট

ট্যাফ্‌ট এক তারবার্তাযোগে উইলসনকে জানালেন যে, সিনেট শান্তিচুক্তি অনুমোদন করবার পূর্বে হয় তো বার্তা-বর্ণিত পদ্ধতিক্রমে তার পরিবর্তন দাবী করবে। বর্ণিত বিষয়গুলির মধ্যে মন্‌রো-নীতি ছিল অন্যতম এবং সে সম্বন্ধে দাবি ছিল এই যে, চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ উক্ত নীতির সারবত্তা স্বীকার করে নেবেন। সে বিষয়গুলি তৎক্ষণাৎ লীগ-চুক্তিপত্রের অঙ্গীভূত হল এবং শান্তিসম্মেলন কর্তৃক তা গৃহীতও হল।

মাসের শেষ দিক করে বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত কমিটি শান্তিচুক্তির শর্তাবলী পরীক্ষা করবার কাজে প্রবৃত্ত হলেন। বিরাটকায় সে দলিলের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য কমিটি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ১৯শে আগষ্ট তারিখে। উইলসন এই ধারণা নিয়ে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন যে, পরীক্ষাধীন যেন তিনি স্বয়ং, চুক্তিপত্র নয়। তাঁর এ-ধারণা যে মিথ্যে নয় সে কথা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে, বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত কমিটি যেদিন তাঁদের বিবৃতি পেশ করলেন। সে বিবৃতির মাধ্যমে মুখ্যতঃ আক্রমণ পরিচালিত হয়েছে প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে : অভিযোগ এই যে, শান্তি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা তিনি ঠিক ভাবে চালাতে পারেন নি, সিনেটকে তিনি অগ্রাহ্য করে চলেছেন, আর তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ?—তা অগণ্য ও অসংখ্য ! মোটের উপর, শান্তি চুক্তি শেষ পর্যন্ত যে আকার নিয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর। প্রায় চল্লিশটি এমন-ধারা সংরক্ষণী ও সংশোধণী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হল যেগুলি গৃহীত হবার উপরে চুক্তিপত্রের অনুমোদন নির্ভরশীল। লক্ষ্য করবার মত তাৎপর্য্য এই যে, চুক্তিপত্রের মধ্যে যেগুলি সত্য-সত্যই দুর্বল স্থান সেগুলির উপর জোর না দিয়ে, সব-খানি জোর গিয়ে পড়েছিল সেই সব বিষয়ের উপর—প্রেসিডেণ্ট যে-গুলির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ পোষণ করেন।

স্পষ্টই বোঝা গেল, উইলসন যে সমর্থন পাবেন বলে আশা করছিলেন তা পাওয়া যাবে না। জাতিসঙ্ঘকে অভিহিত করা হল এক অপরিক্ষীত ধারণা আখ্যায়। প্রেসিডেণ্ট তার প্রতিবাদে বললেন, বরঞ্চ ব্যাপারটা ঠিক তার বিপরীত। লীগ আমেরিকার আত্মিকসত্তা বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমেরিকা গড়ে উঠেছে এই আদর্শের উপরেই ভিত্তি করে এবং সেই আদর্শই ইউরোপের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে করে তারই

ভিত্তিতে সে আপনাকে গড়ে তুলতে পারে। প্রেসিডেণ্টের মতে, এই তত্ত্বটা আজও সম্ভবতঃ আমেরিকানদের বোধগম্য হয় নি।

প্রয়োজন বোধে সদ্ব্যবহার করবার জন্য সুদূর অতীত বাল্যকাল থেকেই তাঁর সহজাত বাগ্মীতা শক্তিকে শাণিত করে তুলেছেন এবং সে অস্ত্র আজও এতটুকু তার তীক্ষ্ণতা হারায় নি। আমেরিকাময় নিজের বাণী প্রচারের জন্য তিনি বেরিয়ে পড়লেন, তাঁর সঙ্গে রইলেন তাঁর পত্নী এবং হোয়াইটহাউসের চিকিৎসক ডাক্তার গ্রেসন। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য প্রেসিডেণ্টের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তার গ্রেসনের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

এই পশ্চিমী পরিক্রমার জন্য তাঁকে যে দৈহিক শ্রম স্বীকার করতে হয় তার চাপ সহ্য করবার সামর্থ্য খুব কম লোকেরই আছে। তাঁকে পর্যটন করতে হয় ওয়াশিংটন থেকে ক্যালিফোর্নিয়া এবং ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পুনরায় কানসাস পর্যন্ত। এই পরিক্রমাকালে কুড়ি দিনের মধ্যে প্রেসিডেণ্টকে ভাষণ দিতে হয় ত্রিশটি। সহনশীলতার অগ্নি-পরীক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রেসিডেণ্ট যখন তাঁর ভ্রমণ-সূচীর দফাগুলি একের পর এক পালন করে চলেছেন, ডাক্তার গ্রেসন তখন গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করে নিজের সহকারী দায়িত্ব পালন করে চলেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে। স্থান হতে স্থানান্তরে অশ্রান্ত পর্যটন পথে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম নেই এবং পর্যটন কালে যাদের সম্মুখীন তাঁকে হতে হচ্ছে, অধিকাংশক্ষেত্রেই তারা এমন বিরূপ মনোভাবাপন্ন যে, তাদের সে আচরণের ফলে তিনি মর্মাহত না হয়ে পারছিলেন না।

যে মাপকাঠির সাহায্যে উইলসন নিজের সবলতা ও দুর্বলতার পরিমাপ করতেন তা হল, মহান নীতির অন্তর্নিহিত বিরাট শক্তি ও সম্ভাবনার উপর তাঁর প্রগাঢ় আস্থা। জাতিসঙ্ঘ যে বৈদেশিক প্রভাবের নিকট নতি স্বীকার নয়, বরঞ্চ আমেরিকার আদর্শেরই এটা ব্যাপকতর আকার মাত্র, এই কথাটা যদি আমেরিকার জনসাধারণ একবার বুঝতে পারে, তা হলে সাগ্রহে যে তারা এ প্রস্তাবকে লুফে নেবে সে সম্বন্ধে তাঁর মনে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু চুক্তিপত্রের অন্তর্নিহিত চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার ব্যাপকতা উপলব্ধি করবার সামর্থ্য জনসাধারণের ছিল না বলে জাতীয় বিচ্ছিন্নতার চিরাচরিত

চিন্তায় চেনা রাস্তা থেকে তাদের সরিয়ে আনা সম্ভবপর হচ্ছিল না। পশ্চিম পরিক্রমা কালে প্রদত্ত কোন একটি ভাষণে উইলসন বলেন :

ওয়াশিংটন-জীবন মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্জন বলে মনে হয়। বিরাট মার্কিন জাতির সত্যকার কণ্ঠস্বর এই বিচিত্র সহরে এসে যে সাড়া জাগায় তা এতো ক্ষীণ যে, মনে হয়, সে শব্দ যেন ভেসে আসছে কোন সুদূর দেশ থেকে। রাজনীতির আলোচনা শুনতে শুনতে মনে হয়, বিবদমান দুই পক্ষই বুঝি বা নিজেদের উত্তেজনার উত্তাপে অর্ধসিদ্ধ হয়ে মোলায়েম হয়ে গেলো। আমেরিকার যে শাদাসিধে ভাষায় কথা বলতে আমি অভ্যস্ত সেই ভাষায় কথা শোনবার জন্য মাঝে মাঝে আমি ওয়াশিংটন থেকে বেরিয়ে আসি, বেরিয়ে আসি সেই বাতাস আমার শ্বাসযন্ত্রে ভরে নিতে—যে বাতাস আমার পক্ষে স্বস্তিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং তারপর কথা প্রসঙ্গে এই কথাটা অঞ্চল বিশেষকে জানিতে দিতে যে, আমেরিকার জনসাধারণ এখনও ভাবতে ভুলে যায় নি।

কান্‌সাস সহরে ভাষণ দান প্রসঙ্গে শ্রোতাদের সম্বোধন করে তিনি বলেন:

আমি প্যারিস থেকে ফিরে এসেছি মানবেতিহাসের মহত্তম দলিল সঙ্গে নিয়ে। যে নীতি ও আদর্শের বেদীমূলে আমেরিকা তার জীবন ও যথা-সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে তাঁর অনুপ্রেরণা দলিলটার পত্রে পত্রে ও ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বলে সে এতো মহান ও এমন বিরাট। সমুদ্রের পরপারের একটি অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ ঘটনা আজ আপনাদের সামনে বিবৃত করতে চাই। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, যে বস্তুটি আমাদের নিকট আমেরিকান-নীতি নামে পরিচিত তা যে শুধু পাশ্চাত্য জাতি সমূহেরই মন ও বুদ্ধির রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে তাই নয়, জাতি সমূহের যাঁরা নায়ক এমন কি, তাঁরাও এই নীতির দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই, এই চুক্তিপত্রে সেই নীতিগুলি যখন সন্নিবেশিত হয়, তখন তা হয়েছিল সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতীতি ও সম্মতি ক্রমে। হে আমার স্বদেশবাসী বন্ধুগণ; এ কথা খুবই সত্য যে, যে নীতিগুলি এই চুক্তিপত্রে স্থান লাভ করেছে, ইতিপূর্বে আর কোন আন্তর্জাতিক আলোচনা সভায় এমন সর্বসম্মত স্বীকৃতি সে কোন দিন পায় নি। মনে রাখবেন, সে নীতি জন্মলাভ করেছে আমাদের প্রিয়তম সেই জন্মভূমির মৃত্তিকায় যার বেদীমূলে আমাদের জীবন ও যথাসর্বস্ব উৎসর্গীকৃত।

দশ

অন্য আর এক ক্ষেত্রে

সিনেটের বৈদেশিক দপ্তর সংক্রান্ত কমিটিকে আমি সেদিন স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, তাঁদের সঙ্গে যে বৈঠকে আমি মিলিত হই, জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বৈঠক সেটা নয়। গত মার্চ মাসে আমি যখন স্বদেশে ফিরে আসি তখনও উক্ত কমিটির সঙ্গে আমি এক বৈঠকে মিলিত হই এবং তাঁরা স্থানে স্থানে বাচন ভঙ্গীগত কিছু কিছু পরিবর্তন প্রস্তাব করেন। আমি সে প্রস্তাব সহ প্যারিসে ফিরে গেলে সম্মেলন কর্তৃক তার প্রতিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ থেকেই আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, ক্ষতি সাধনের কোনরকম ষড়যন্ত্র এর পিছনে নেই। দলিলখানা আগা-গোড়া লিখিত হয়েছে সহজ, সুস্পষ্ট ও বাস্তব-সম্মত কার্যকরী ভঙ্গীতে এবং সে দলিল শান্তি স্থাপনের জন্য যে পথ নির্দেশ করে, সত্যকার শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা তাই।

ওমাহাতে তিনি এই বলে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেন :

চুক্তিপত্র পুনরায় নতুন আকারে আমরা রচনা করতে পারি না। আমাদের হয় একে গ্রহণ করতে হবে, নয় বর্জন করতে হবে। পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ যে দলিলের উপর স্বাক্ষর দান করেছে তা বাতিল করে দিয়ে আবার নতুন আকারে চুক্তিপত্র রচনা করা যে দুঃসাধ্য ব্যাপার আশা করি, ভদ্রমহোদয়গণ তা বুঝতে পারছেন।

প্রেসিডেণ্ট তাঁর বক্তব্যের অনুকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী এলাকা থেকে সমর্থন সূচক যে হৃদ্যতাপূর্ণ সাড়া পান, পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে তাঁর পক্ষে তা লভ্য হয় নি। স্পোকেনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই তিনি এ দাবি জানান যে, চুক্তিকে দেখতে হবে দলীয় ও ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

এমন বহু লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে যাঁরা বলেন, "আমি রিপাবলিকান, কিন্তু জাতিসঙ্ঘের আমি পক্ষপাতী"। 'কিন্তু' কথাটির ব্যবহার কেন? একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই: এই ব্যাপারের মধ্যে এমন একটা জিনিস এসে পড়েছে যা আসা কোন ক্রমেই উচিত ছিল না। আমার মতে, সে জিনিসটি হল ব্যক্তিগত তিক্ততা। কেউ হয়তো মনে করতে পারেন, জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত চুক্তিপত্রের প্রথম উদ্ভাবক ও লেখক উইলসন নামক কোন এক ব্যক্তি এবং জাতিসঙ্ঘের ধারণা প্রথম জাগে সেই ব্যক্তিটির চিন্তায়। তা যদি হোত, আমি সুখীই হতাম। কোন কার্যের কর্তারূপে যদি আমার নাম লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়, তা হলে আমি চাইব, এই কথাই লিখে রাখা হোক যে, জীবনে এই একটি কাজ ছাড়া অন্য কোন কিছু আমি করি নি। কিন্তু ব্যাপারটা হল এই যে, আমি এ কাজ করি নি। আমার হাজার হাজার দেশবাসীর সঙ্গে আমিও এই বস্তুটির ধারণা সর্বপ্রথম লাভ করি বিশ বছর আগে এবং তা করি রিপাব্‌লিকান-দলীয় রাজনীতিকদের কাছ থেকে। আমি যদি রিপাব্‌লিকান হতাম, তা্‌ হলে আমি এই কথাই বলতাম যে, "যেহেতু আমি রিপাব্‌লিকান সেই জন্যই আমি জাতিসঙ্ঘের সমর্থক।" আমি এখন চাই যে, জাতিসঙ্ঘকে দেখা হোক বর্তমান বক্তা হতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে। আমি এর উদ্ভাবক এবং এটা আমার হাতে গড়া বস্তুও নয়। পুরুষানুক্রমে যাঁরা শান্তি এবং ন্যায় বিচার কামনা করে এসেছেন, এ বস্তুটি উদ্ভূত হয়েছে তাঁদের বিবেক ও বুদ্ধি হতে। জনস্বার্থ সংক্রান্ত প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তার অতিরিক্ত অন্য কোন সম্পর্ক এর সঙ্গে আমার নেই; যে সম্পর্কের অনুরোধে কোন একজন লোক তার দেশবাসিগণের চিন্তা ও ভাবনাকে ভাষা দিতে চায়, এই প্রশ্নের সঙ্গে আমি সেইটুকু সম্পর্ক মাত্র বহন করি।

এই মহান শাসন ব্যবস্থার যাঁরা আদি প্রবর্তক—সেই ওয়াশিংটন,

হ্যামিলটন, জেফার্সন ও অ্যাডাম্‌স প্রভৃতিকে আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকার আত্মিক-সত্তার বিশ্ব-বিজয়ে বহির্গত হবার মহান দৃশ্য তাঁরা বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করছেন।

উইলসনের বক্তব্য ছিল এই। আমেরিকার আত্মিক-সত্তা যেমন সমগ্র মার্কিন জাতির হৃদয় জয় করেছে, তেমনি সে বহির্গত হোক বিশ্ব-বিজয়ের অভিযানে। তিনি চেয়েছিলেন, ওয়াশিংটন ও জেফার্সনীয় নীতি বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি লাভ করুক। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তিনি জাতি-সঙ্ঘ গঠনের সংগ্রামে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

কিন্তু বিজয় যে আশুলভ্য নয় এ কথা দিনে দিনে তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে লাগলো। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র সম্বন্ধে আমেরিকার ধারণার প্রসার ও প্রচারের মধ্যেই তাঁর আদর্শ সীমাবদ্ধ ছিল না। নিউ-টেষ্টামেন্টে ভ্রাতৃত্ব সংক্রান্ত যে আদর্শ লিপিবদ্ধ আছে, তার বিশ্বজনীন স্বীকৃতিও তাঁর আদর্শের অন্তর্গত। দায়িত্বের দুরূহতার পরিমাণ চিন্তা করে ক্ষান্ত হবার লোক তিনি নন। সংগ্রাম পরিচালন ব্যাপারে তিনি পোষণ করতেন ধর্মযুদ্ধের সৈনিকোচিত নিষ্ঠা। কিন্তু ঔদাসীন্য, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস তাঁকে অন্তরে অন্তরে পীড়িত করে তুলতে লাগলো। তাঁর দায়িত্ব তাঁর দেহের কাছ থেকে যে সেবা ও শ্রম দাবি করে, তা প্রায়ই তাঁর পক্ষে মেটানো সম্ভব হোত না। তবু প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত চললো তাঁর যাওয়া-আসা। চিকিৎসকের পরামর্শ উপেক্ষা করে চললো প্রতিটি সভা-সমিতিতে যোগদানের পালা। অবশেষে উইচিটায় উপনীত হয়ে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। কাজেই পরিক্রমা-সূচী পরিত্যক্ত হল এইখানে এসে, এবং প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

সহানুভূতির স্রোত প্রবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার ধারা রুদ্ধ হল হিংস্র জনরবের গাত্রে প্রতিহত হয়ে। গত তিন সপ্তাহ ধরে তিনি যত কথা বলে আসছেন সে সবই চাপা পড়ে গেলো সেই জনরবের জঞ্জালের তলায়। রণক্লান্ত বীরের দেহ পরিণত হল বিদ্বেষের ভোজ্য বস্তুতে। জনরব চাপা গলায় এই বার্তা রটনা করতে লাগলো যে, প্রেসিডেন্ট বর্তমানে অক্ষম ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছেন।

উইলসন এই সব আক্রমণের জবাবে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।

সমালোচনার নিকট দৃশ্যতঃ আত্মসমর্পণ ছিল তাঁর জীবনের অবিচল নীতি। সে নীতি বিরুদ্ধবাদীদের কাছে যে পরিমাণ আনন্দদায়ক, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিরক্তিকর ঠিক সেই অনুপাতে। সত্যের অন্তর্নিহিত শক্তির উপর ছিল তাঁর রহস্যবাদী সুলভ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, আজ হোক অথবা কাল হোক সে শক্তির বিকাশ ঘটবেই, তাই কোন ব্যাপারে ধৈর্য-চ্যুত তিনি হতেন না। সেই কারণেই বিদ্বেষ-দুষ্ট এই সব গুঞ্জন সত্ত্বেও তিনি নীরবতা ভঙ্গ করলেন না। তাঁর বুদ্ধি বৃত্তি কিন্তু বিন্দুমাত্র প্রাখর্য হারায় নি। তাঁর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ার কয়েক দিন পরে তাঁর কন্যা মার্গারেট একদা পাশে বসে তাঁকে একখানা বই পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তিনি শুনছিলেন আর মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে কন্যাকে শিখিয়ে দিচ্ছিলেন কোন কোন শব্দ বিশেষের সঠিক উচ্চারণ। এ শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। সে দিনের সে ঘটনা স্মরণ করে মার্গারেট একদা মন্তব্য করেন যে, দৈহিক অক্ষমতা সত্ত্বেও তাঁর মানসিক শক্তির এতটুকু ব্যত্যয় ঘটেনি।

ইতিমধ্যে চুক্তিপত্র সিনেটের হাতে এসে পৌছল। দলিলটি তৈরী করতে সময় লাগে প্রায় পাঁচ মাস এবং এত দীর্ঘ সময় লাগার জন্য দলিলের রচয়িতাদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ সেই দলিলকে কেন্দ্র করে তর্ক-বিতর্ক, আক্রমণ ও আলোচনা চলে আট মাস ধরে। বৈদেশিক দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি সিনেটর লজ্ ছিলেন জাতিসঙ্ঘের সর্বাপেক্ষা অক্লান্ত প্রতিপক্ষ। তিনি পরিহাসছলে সে সঙ্ঘের নাম দিয়েছিলেন 'উইলসনের সঙ্ঘ'। ডেমোক্রাটিক দলীয় প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন বিজ্ঞাপিত হবার পূর্বে লজ্ বলেছিলেন যে, ভবিষ্যত প্রয়োজনের দিকে চেয়ে এই ধরণের একটা সঙ্ঘ গঠন করবার আবশ্যকতা আছে, রিপাব্লিকান দলীয় নেতা নভেম্বরের গোড়ার দিকে চৌদ্দ দফা সংরক্ষণী সর্ত সম্বলিত এক পরিকল্পনা সিনেটের সম্মুখে পেশ করেন। চুক্তিপত্রে উইলসন যে চৌদ্দ দফা শর্ত সন্নিবেশিত করেন, সম্ভবতঃ তাকে ব্যঙ্গ করবার উদ্দেশ্যেই এই পরিকল্পনাতেও চৌদ্দটী দফার সন্নিবেশ ঘটে। সে বিদ্রূপ বিশেষ করে তীব্র হয়ে ওঠে জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত চুক্তির দশম ধারার বিরুদ্ধে। প্রেসিডেণ্ট গভীর মনোযোগের সঙ্গে শর্তগুলি পরীক্ষা করবার

পর ঘোষণা করলেন যে, প্রস্তাবটি যে আকারে এসেছে তাতে করে অনুমোদন লাভ অপেক্ষা প্রত্যাখ্যান পাবার পক্ষেই তার যোগ্যতা সমধিক। সিনেট সদস্যদের তিনি পরামর্শ দিলেন লজের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতে। [illegible] উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হল। সিনেটে এমন অতি অল্প সংখ্যক লোকই ছিলেন যাঁরা মনে-প্রাণে চুক্তি[illegible] পত্রের পরাজয় [illegible] করতেন। কারণ, তাঁদের ধারণা, চুক্তিপত্র যদি পরাজিত হয় তাহলে তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশান্তি দেখা দিতে পারে। কিন্তু লজ্ অথবা উইলসন এই দুইজনের মধ্যে কেউই কারও কাছে নতি স্বীকার করতে রাজী নন। লজের প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, তাহলে প্রেসিডেন্টের বিশ্বাস, তার ফলে চুক্তিপত্রের প্রাণশক্তিই নিষ্পেষিত হয়ে যাবে। তিনি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে চললেন এই বিশ্বাসেরই বশবর্তী হয়ে। তাঁর দৃঢ় ধারণা, জনসাধারণ তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরে চুক্তিপত্রের স্বপক্ষে সমর্থন জানাবেই। তিনি প্রস্তাব করলেন, আগামী বৎসরের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে বিষয়টি সম্বন্ধে গণভোট গ্রহণ করা হোক। ঠিক এই সময়ে এরই সঙ্গে আর একটি প্রস্তাব এসে হাজির। প্রস্তাবটি হল: ভার্সাই শান্তি-চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, আসুন আমরা জার্মানীর সঙ্গে স্বতন্ত্র শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করি। ১৯শে নভেম্বর তারিখে অনুমোদন-প্রার্থী লজ্-প্রস্তাব পরাজিত হয় এবং তৎসহ চুক্তিপত্রকেও সরিয়ে রাখা হয় সাময়িক ভাবে।

তার পর কয়েক মাস ধরে চললো বিতর্কের উচ্চতর তরঙ্গ বিক্ষেপ। এদিকে উইলসন তখন হোয়াইটহাউসে অসহায় ভাবে শয্যাশায়ী, তিনি না পারেন কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হতে। এমন কি, না পারেন নিজের মন্ত্রী সভার সঙ্গে পর্যন্ত বৈঠকে মিলিত হতে। এরূপ অবস্থায় জনমত যাচাই করার কোন উপায়ই তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। অথচ লীগের বিরোধী যাঁরা, স্বচ্ছন্দে তাঁরা খোলা মাঠে খেলে বেড়াচ্ছেন।

জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ওয়াশিংটনের বিদায় অভিভাষণ ও জেফার্সনের বৃটিশ-বিদ্বেষের কথা। প্রচার করা হতে লাগলো যে, বিচ্ছিন্নতা নিয়েই আমেরিকা এতদিন বেঁচে আছে এবং চিরদিন বেঁচে থাকবে। যাঁদের দাবি যে, তাঁরা শতকরা একশো ভাগই আমেরিকান, তাঁদের অক্লান্ত কর্মতৎপরতার ফলে শ্রমিক, কৃষক, উদারনৈতিক মতা-

বলম্বী অংশ এবং নিগ্রোরা পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল এক একটি বিদ্রোহী সংস্থা রূপে। এ রকম অবস্থায় ১৯২০ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে আমেরিকান সিনেটে শান্তি-চুক্তি যখন প্রত্যাখ্যাত হল, সে প্রত্যাখ্যান অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা রূপে আসেনি। এমনকি, সিনেটের ডেমোক্রাটিক দলীয় সদস্যগণ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্টকে সমর্থন করে উঠতে পারলেন না। তাঁদের মধ্যে চব্বিশ জন দাঁড়ালেন প্রেসিডেণ্টের পক্ষে এবং তেইশজন তাঁর বিপক্ষে। শান্তি-চুক্তি তাঁর হাতে ফিরে এলো অনমুমোদিত অবস্থায়।

আগামী নির্বাচন সম্বন্ধে উইলসনের মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছিল বহু পূর্বেই। জ্যাক্সন দিবস উপলক্ষে লিখিত পত্রে জানুয়ারী মাসে তিনি প্রস্তাব করেন যে, জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আগামী নভেম্বর মাসে গণভোট গ্রহণ করা হোক। জুন মাসে সানফ্রান্সিসকোতে ডেমোক্রাটিক দলের জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন হয়, জেম্‌স এম্ কক্স তাতে মনোনয়ন লাভ করেন দলীয় প্রার্থীরূপে। সে সম্মেলনে উইলসনকে পুনরায় মনোনয়ন দান সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠলো না। নেতারা স্বচ্ছন্দে সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন এবং একবারের জন্যও ভেবে দেখলেন না যে, পার্টিকে তাঁরা কি বিপর্যয়ের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চলেছেন।

হবু প্রেসিডেণ্ট-নির্বাচনকারী কর্ণেল হার্ভে এর আগে উইলসনের প্রার্থীত্বেরই পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এবারে তিনি তৎপর হয়ে উঠলেন এমন এক জন প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়ন লাভের জন্য তাঁর ধারণা—যাঁকে বাগে আনা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য হবে, ওয়ারেন জি, হার্ডিং হলেন সেই নূতন প্রার্থী। এদিকে হার্ভে ইতিমধ্যে ডেমোক্রাটিক দল ছেড়ে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করেছেন। কে প্রেসিডেণ্ট হবেন এইটাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান বিচার্য বিষয়, নীতি নিয়ে তাঁর আদৌ মাথাব্যথা ছিল না।

নির্বাচনে রিপাব্লিকান দল বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয় অর্জন করল। হার্ডিং-এর পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় সত্তর লক্ষ। রীড, রুজভেল্ট এবং লজ্‌দের জয় জয়কার। ১৯২১ সালের ৪ঠা মার্চ নূতন প্রেসিডেণ্টের অভিষেক দিবস। হোয়াইটহাউসের কর্মক্লান্ত অধিবাসী স্থির করলেন, সে অনুষ্ঠানে তার ভূমিকা যথাসাধ্য অভিনয় করবেন।

নিজের উত্তরাধিকারীর পাশে বসে তিনি অগ্রসর হলেন সরকারী ভবনের অভিমুখে। শেষ মুহূর্তে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অনুষ্ঠান দেখতে হলে তাঁকে আরও কয়েক ধাপ উপরে উঠতে হবে। সে কাজ অসাধ্য ভেবে তিনি সে চেষ্টা হতে বিরত হলেন এবং স্বভাব-সুলভ কৌতুকের বশে বললেন, "সিনেট আমাকে আছড়ে ফেলে দিয়েছে বটে, কিন্তু তাই বলে ভূমিশয্যা গ্রহণ করতে আমি চাই না।"

উড্রো উইলসন অতঃপর রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ব্যাধির আক্রমণে দেহ পর্যুদস্ত হলেও, পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও আদর্শের চূড়ান্ত বিজয়ের উপরে তাঁর বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয় নি। রাষ্ট্রসঙ্ঘে যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ প্রত্যক্ষ করবার জন্য হয়তো তিনি বেঁচে থাকবেন না। কিন্তু যে সঙ্ঘকে আমেরিকার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় তিনি প্রাণপাত করেছেন, আমেরিকা অবশেষে সে প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ যে একদা গ্রহণ করবেই সে বিষয়ে তাঁর মনে সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। "মানুষ মরণশীল কিন্তু আদর্শ অমর" এই ছিল তাঁর বাণী।

উইলসন সভ্যজগতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ব্যক্তিরূপে গণ্য হলেও, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাধারণের মধ্যে তাঁর পরিচিত ছিল অতিশয় অল্প। সংবাদপত্র সমূহ প্রাধান্য দিত তাঁর প্রতিভাকেই, কাজেই তাঁর ব্যক্তিত্ব তার চাপে পড়ে বিকাশ লাভ করতে পারতো না। কিন্তু একটা মানুষের দেহ তো আপদ-মস্তক কেবলমাত্র মগজ দিয়ে গড়া হতে পারে না! পেজ একদা তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান তিনি যেন এক বন্ধনহীন বুদ্ধিমত্তা মাত্র"। পেজের এই মন্তব্য উইলসন হেসে উড়িয়ে দেন।

তিনি যে স্বভাবতঃ স্বৈরতন্ত্রী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তৎ-সত্ত্বেও তাঁর আচরণে কোথাও আত্মকেন্দ্রিকতার লেশমাত্র ছিল না। একথাও সত্য যে, তিনি সব কিছু দেখতেন তাঁর ভাবাবেগ-বিহীন প্রখর যুক্তির আলোকে, কিন্তু তবু তাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল ভাবাবেগের দ্বারা আন্দোলিত এবং তারই বর্ণ-বৈচিত্র্যে রঙীণ। স্বভাবতঃ তিনি ছিলেন গঠন-শিল্পী। তিনি আমেরিকার জন্য শান্তি ও গণতন্ত্রের এমন এক দেউল গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে আমেরিকার কল্যাণকর প্রভাব সর্বত্র অবাধে ছড়িয়ে পড়তে পারবে। একে যদি আদর্শবাদিতা বলতে চান, বলতে

পারেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এ বিশ্বাস পোষণ করে গেছেন যে, তাঁর জাতিসমূহের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন একদিন না একদিন বাস্তবে রূপায়িত হবেই। তথাপি বাস্তববাদী রাজনীতিক বলতে লিঙ্কনের পর তাঁকেই বোঝায়। বন্ধুলাভের আগ্রহ তাঁর ছিল অপরিসীম, কিন্তু তবু বন্ধুত্বের কাছে তিনি কোনদিন আত্মসমর্পন করেন নি।

তাঁর পরিবারের উপর, স্ত্রী-পুত্র কন্যা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের উপর উইলসনের স্নেহ ও প্রীতি ঝরে পড়তো অজস্র ধারায়। তাঁদের কাছে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল আনন্দের এক বিশ্ব-জোড়া বিশাল অঙ্গন বিশেষ। মুষ্টিমেয় যে কয়জন লোক তাঁকে ঘনিষ্টভাবে জানতেন তাঁদের কাছে তিনি প্রতিভাত হতেন স্নেহপ্রবণ, কৌতুকপ্রিয় ও শান্ত প্রকৃতির মানুষরূপে, জ্ঞানতপস্বীসুলভ নীরস কঠোরতার কোন পরিচয় তাঁরা পেতেন না।

কর্ণেল হাউস উইলসনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে দু-চারটি কথা লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন :

প্রেসিডেন্টের যে কেবলমাত্র মুখাবয়বেরই পরিবর্তন হয়, তা নয়। তাঁর মত জটিল এবং দুর্বোধ্য চরিত্রের লোক আমি খুব কমই দেখেছি। তাঁর আচরণ এমন স্ববিরোধী যে তাঁর সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করাই এক বিপজ্জনক ব্যাপার। উড্রো উইলসনের সান্নিধ্যে একবার পৌঁছোতে পারলে মনে হবে, এমন চমৎকার আর একটি লোক সারা পৃথিবী খুজে পাওয়া যাবে না। আমি এমন একজন লোকও দেখিনি যিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বিরাট প্রভাব তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে সচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারতেন।

একদিন কোন একজন লোক ওয়াশিংটনের রাস্তা দিয়ে চলবার সময়ে হঠাৎ উইলসনকে দেখতে পায়। সেই সাক্ষাতের বিবরণ দিতে গিয়ে সে বলে, "তাঁর দিকে চাইতেই তিনি আমার দিকে মুখ ফেরালেন এবং ফেরাবামাত্র দেখি আমার মাথার টুপি কখন আমার অজ্ঞাতসারেই নেমে এসেছে আমার হাতে। সে যেন জাতীয় পতাকার উদ্দেশ্যে অভিবাদন জ্ঞাপন!" দীর্ঘদিন রোগ যন্ত্রণা ভোগের পর ১৯২৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর উড্রো উইলসন বললেন, "আমি প্রস্তুত"। এই তাঁর শেষ কথা।

ঘটনার দিনপঞ্জি

১৮০৭ জেম্‌স উইলসনের আমেরিকা-যাত্রা

১৮৩৬ টমাস উড্রোর আমেরিকা যাত্রা

১৮৫৬ ২৮শে ডিসেম্বর টমাস উড্রো উইলসনের জন্মদিন

১৮৭৫ উইলসনের প্রিন্সটন গমন

১৮৭৯ ক্যাবিনেট গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে লিখিত উড্রো উইলসনের প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয় এই বৎসরে এবং এই বৎসরেই প্রিন্সটন থেকে স্নাতকোত্তীর্ণ হয়ে তিনি ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করেন

১৮৮২ ১লা জুন উইলসন জর্জিয়ার অন্তর্গত অ্যাটলাণ্টায় যান এবং সেখানে যৌথভাবে ই, জে, রেণিকের সঙ্গে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন

১৮৮৩ ১৮ই সেপ্টেম্বর তিনি জনহপ্‌কিন্সে প্রবেশ করেন

১৮৮৫ ২৪শে জানুয়ারী 'কংগ্রেস্যানাল গভর্নমেণ্ট' নামক তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়

১৮৮৫ ২৪শে জুন এলেন এক্‌সনের সঙ্গে তার বিবাহ

১৮৮৫ তিনি ব্রীণ মওয়ারে যান

১৮৮৮ উইলসন পরিবারের ওয়েস্‌লীয়ান গমন

১৮৮৯ উইলসনের 'দি ষ্টেট' নামক গ্রন্থের প্রকাশ

১৮৯০ সেপ্টেম্বর, অধ্যাপক রূপে তিনি প্রিন্সটনে যান

১৮৯৩ 'ডিভিসন এণ্ড রিইউনিয়ন,' 'মিয়ার লিটারেচার' এবং 'অ্যান ওল্ড-মাষ্টার' নামক তাঁর পুস্তক ত্রয়ের প্রকাশ

১৮৯৬ তাঁর 'জর্জওয়াশিংটন' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বছরেই তাঁর প্রথম বিদেশ যাত্রা এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ উপলক্ষে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ

১৯০২ তাঁর 'হিষ্ট্রি অব্ দি আমেরিকান পিপ্‌ল' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়

১৯০৮ তাঁর রচিত 'কনষ্টিটিউশনাল গভর্নমেণ্ট' নামক গ্রন্থের প্রকাশ

১৯১০ ১৫ই সেপ্টেম্বর, নিউজার্সীর গভর্নর পদের জন্য উইলসনের মনোনয়ন

১৯১০ নভেম্বর, গভর্নর পদে তাঁর নিয়োগ

১৯১১ ১৭ই জানুয়ারী, গভর্নর-পদ অনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ

১৯১২ ২রা জুলাই, ৪৬তম ব্যালটের বলে উড্রো উইলসনের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য মনোনয়ন লাভ

১৯১২ ৪ঠা নভেম্বর, উইলসন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন

১৯১৩ ৪ঠা মার্চ, আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিষেক

১৯১৩ ৩রা অক্টোবর, আণ্ডারউড-সাইমন্স ট্যারিফ বিলে স্বাক্ষর দান

১৯১৩ ট্যারিফ কমিশন নিয়োগ

১৯১৩ ২৩শে ডিসেম্বর, ফেডারেল রিজার্ভ অ্যাক্‌টে উইলসনের স্বাক্ষর দান

১৯১৪ ২৮শে জুন, আর্কডিউক ফার্ডিনাণ্ডের হত্যাকাণ্ড

১৯১৪ পয়লা আগষ্ট, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা

১৯১৪ ৩রা আগষ্ট, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জার্মানীর যুদ্ধ ঘোষণা

১৯১৪ ৪ঠা আগষ্ট, জার্মানীর বিরুদ্ধে গ্রেট-বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণা

১৯১৪ ৬ই আগষ্ট, এলেন অ্যাক্‌সন উইলসনের মৃত্যু

১৯১৪ ১৮ই আগষ্ট, উইলসনের নিরপেক্ষতা ঘোষণা

১৯১৪ অক্টোবর, ক্লেটনের ট্রাষ্ট বিরোধী বিল

১৯১৫ ফেব্রুয়ারী, জার্মানী কর্তৃক বৃটিশ দ্বীপ-পুঞ্জের চতুর্দিকস্থ এলাকা যুদ্ধাঞ্চল রূপে ঘোষণা

১৯১৫ ৭ইমে, 'লুসিটানিয়া' জাহাজের নিমজ্জন

১৯১৫ ১৮ই ডিসেম্বর, মিসেস গল্টের সঙ্গে তাঁর বিবাহ

১৯১৬ ২৭শে জানুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করবার উদ্দেশ্যে উইলসনের মধ্য-পশ্চিম পরিক্রম

১৯১৬ ২৪শে মার্চ, সাসেক্‌স নামক জাহাজের নিমজ্জন

১৯১৬ ১৫ই জুন, উইলসনের পুনরায় মনোনয়ন লাভ

১৯১৬ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট পদে উইলসনের পুনর্নির্বাচন

১৯১৬ ১৮ই ডিসেম্বর, যুদ্ধের কারণ জানিবার জন্য উইলসন কর্তৃক যুদ্ধমান জাতি সমূহের নিকট লিপি প্রেরণ

১৯১৭ ৩১শে জানুয়ারী, জার্মানী কর্তৃক বেপরোয়া ডুবো-জাহাজী যুদ্ধের নীতি ঘোষণা

১৯১৭ ৪ঠা মার্চ, উইলসন কর্তৃক দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠানিক ভাবে শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ

১৯১৭ ২রা এপ্রিল, উইলসনের যুদ্ধ সংক্রান্ত বাণী ঘোষণা

১৯১৭ ৬ই এপ্রিল, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

১৯১৭ ১৮ই মে, সিলেক্টিভ সার্ভিস অ্যাকট পাশ

১৯১৭ জুন, আমেরিকান সৈন্যদল সহ জেনারেল পার্শিং-এর ফ্রান্স যাত্রা

১৯১৭ নভেম্বর, বলশোভিকগণ কর্তৃক কেরেনেস্কী-সরকারের উচ্ছেদ সাধন

১৯১৭ ১১ই ডিসেম্বর, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

১৯১৭ ২৬শে ডিসেম্বর, রেল লাইন সমূহকে সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনায়ন

১৯১৮ ৮ই জানুয়ারী, উইলসনের চৌদ্দ দফা শর্ত সম্বলিত ভাষণ দান

১৯১৮ ২০শে মে, ওভারম্যান অ্যাকট পাশ

১৯১৮ ১১ই নভেম্বর, যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা

১৯১৮ ১৩ই ডিসেম্বর, উইলসনের ব্রেষ্টে উপস্থিতি

১৯১৮ ২৫শে ডিসেম্বর, মার্কিন সেনাবাহিনীর সঙ্গে উইলসনের বড়দিন স্থাপন

১৯১৯ ১৮ই জানুয়ারী, শান্তি-সম্মেলনের প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশন

১৯১৯ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, উইলসন কর্তৃক শান্তি-সম্মেলনের সম্মুখে জাতিসঙ্ঘ সংক্রান্ত দলিলের উপস্থাপন

১৯১৯ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, উইলসনের যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা

১৯১৯ ১৪ই মার্চ, তাঁর পুনরায় ফ্রান্স প্রত্যাবর্তন

১৯১৯ ৭ই মে, জার্মানীর কাছে শান্তি-চুক্তির খসড়া পেশ

১৯১৯ ২৮শে জুন, ভার্সাই শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া

১৯১৯	১০ই জুলাই, উইলসন কর্তৃক শান্তি-চুক্তি পত্র সিনেটের সম্মুখে উপস্থাপন
১৯১৯	৩রা সেপ্টেম্বর পশ্চিমাঞ্চল পরিদর্শনে যাত্রা
১৯১৯	২৬শে সেপ্টেম্বর কান্সাসের অন্তর্গত উইচটায় তাঁর ব্যাধির আক্রমণ
১৯১৯	১৯শে নভেম্বর, সিনেট কর্তৃক চুক্তিপত্রের প্রত্যাখ্যান
১৯২০	নভেম্বর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে হার্ডিং এর নির্বাচন
১৯২০	ডিসেম্বর, উইলসনের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ
১৯২১	মার্চ, রাজনীতি থেকে উইলসনের অবসর গ্রহণ
১৯২৪	ফেব্রুয়ারী, উড্রো উইলসনের মৃত্যু
